ইচ্ছামতী

শীত সংখ্যা ২০১২



সূচীপত্র

প্রথম পাতাঃশীত সংখ্যা ২০১২.....1
প্রচ্ছদকাহিনীঃ সাদা-কালো.....3
কমিক্স: সেদিন মহেঞ্জোদারো.....7
মজার পাতা.....43
শীতের গপ্পো.....45
ছোট নাটক: সুড়সুড়িও ভীষণ অতি.....47
ছড়া-কবিতা.....50
আমি ও আমার ভূত.....50
টিয়া 52
সরল সত্য.....53
ভারত রতন.....54
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি 55
হেমন্ত আর শীত 57
এলো যে শীত.....59
গল্প-স্বল্প.....60
পিন্টু ও একটি চশমা.....60
জীয়ন ঝর্ণার জল.....65
ভবিষ্যতের পৃথিবী.....72
রাক্ষসের মত.....76
বিদেশী রূপকথা: সাবান বিক্রেতার ছেলে.....81
পড়ে পাওয়া: আরে অর্থাৎ.....86
পুরাণকথা: উড়ন্ত ক্যাঙ্গারু.....87
স্বাধীনতার গল্প: পর্ব ৬.....89
বায়োস্কোপের বারোকথা: তারকাদের আবির্ভাব.....91
ছবির খবর: টিনটিন – সিক্রেটস অফ দি ইউনিকর্ন.....94
দেশে-বিদেশে.....96
অ-পূর্ব সিকিম.....96
মিসৌলাতে কয়েকদিন 101
পরশমণি: পদার্থের প্রসারন.....107
এক্কা-দোক্কা: ফর্মূলানন্দ.....110
আঁকিবুকি.....116

প্রথম পাতাঃশীত সংখ্যা ২০১২

প্রায় মাসখানেক হতে চলল এসে গেছে ইংরেজি নতুন বছর ২০১২ সাল। একটু দেরিতে হলেও, তোমাকে নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা জানাই।

নতুন বছরের আগে এসেছিল শীত। সিরসির করে উত্তর দিক থেকে হিমেল হাওয়া বইল। বাগানে ফুটল রংবাহারি মরসুমি ফুল। ফলের দোকানে কমলালেবুর পাহাড়। সব্জীবাজারে ফুলকপি, পালং, মটরশুঁটি। মিষ্টির দোকানে নলেন গুড়ের সন্দেশ। ভোরেরবেলা কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে চলে সোয়েটার, মাফলার, গরম টুপি, নরম শাল। কথা রাখতে গেলে ইচ্ছামতীর এসে যাওয়া উচিত ছিল নতুন বছরের সাথে সাথেই। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল। তাতে তুমি খুব রেগে যাওনি নিশ্চই? দেরীতে এলেও ইচ্ছামতীর নতুন শীত সংখ্যা ২০১২ কিন্তু পুরোপুরি সেজে এসেছে। রয়েছে আমাদের নতুন প্রচ্ছদকাহিনী 'সাদাকালো'। পড়তে ভুলো না দেশে-বিদেশে বিভাগের 'অ-পূর্ব সিকিম' আর এক্কা-দোক্কা বিভাগের 'ফর্মূলানন্দ'। বেশ কয়েকটা গল্প, ছড়া আর নিয়মিত বিভাগগুলির সাথে ইচ্ছামতী নিয়ে এসেছে দুয়েকটা চমক। কি চমক, সেটা জানতে হলে উলটে পালটে দেখতে হবে ইচ্ছামতী।



শীত কাল মানেই ঠাণ্ডার সাথে অনেক মজা। কেমন শুরু করলে নতুন বছর? কোথাও বেড়াতে গেছিলে নাকি? আর ২৪শে ডিসেম্বর রাতে স্যান্টাক্লস এসে তোমার মোজায় গিফ্‌ট্ রেখে গেছেন নাকি? আমাকে জানিও কিন্তু।

কারোর কারোর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, নতুন ক্লাসে ওঠার পালা। কেউ মেতে উঠেছে চড়ুইভাতির আনন্দে, কেউ দেখতে যাচ্ছে সার্কাস। শীতের উতসব এবং উদযাপনগুলিকেই বা ভুলি কি করে? ২৫শে ডিসেম্বর ছিল বড়দিন, তারপরে ১লা জানুয়ারি নতুন বছর। এবছর ১২ই জানুয়ারি ছিল

স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী। সামনেই রয়েছে ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিন আর আজ, ২৬শে জানুয়ারী আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস। আর তারপরে পরেই রয়েছে সরস্বতী পুজো। মানে, মোটামুটি জমজমাট শীতকাল।



এখন অবশ্য শীত যাই যাই করছে। শীত চলে যাওয়া আর বসন্ত আসার এই সন্ধিক্ষণে, তোমার সঙ্গী হোক নতুন ইচ্ছামতী।

ভাল থেক।

চাঁদের বুড়ি
বৃহস্পতিবার,
২৬শে জানুয়ারি, ২০১২
১১ই মাঘ, ১৪১৮

ছবিঃ ইন্টারনেট

প্রচ্ছদকাহিনীঃ সাদা-কালো

আমাদের এই সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী "সাদা-কালো"।

শুনে তুমি বলবে, কিরকম একটা ম্যাড়মেড়ে বিষয়বস্তু রে বাবা! সব ছেড়ে শেষে কিনা সাদা রঙ আর কালো রঙ নিয়ে আলোচনা! আরে, আমরা কথাবার্তা শুরু তো করি, তার পরে দেখা যাক "সাদা-কালো " নিয়ে আমাদের আলোচনা কোন দিকে এগোয়।

আচ্ছা, সাদা রঙের কয়েকটা জিনিষের নাম বলা যাক। যেমন ধর, মেঘ, তুষার, রাতের আকাশের তারা আর চাঁদ, ঝিনুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মুক্তো - এছাড়া আমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা হরেক জিনিষ অথবা প্রানীর রঙ সাদা। আর যদি কালো রঙের কথা বলা হয়? - মাথার চুল, চোখের মণি, রাতের আকাশ, অন্ধকার, এই সবই কালো রঙের।

আমার দুই বন্ধু ইকির আর মিকির কে বললাম সাদা আর কালো রঙ দিয়ে ছবি আঁকতে। তো তারা কি আঁকল জান? ইকির আঁকল কালো আকাশের গায়ে ছোট্ট ছোট্ট ঝিকমিকে সাদা তারা আর একটা সাদা গোল চাঁদ। সেই চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ল নদীর জলে, ছুঁয়ে গেল গাছের পাতা। আর মিকির আঁকল আঁধার কালো দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা সাদা সাদা অশরিরীর দল। তাদের কুলোর মত কান আর মূলোর মত দাঁত। ছবি দুটোকে পাশাপাশি রেখে দেখালাম দুইজনকে। বললাম- দেখ, সাদা আর কালো তো দুটো রঙ মাত্র। সেই দুটো রং ব্যবহার করে তুমি ইকিরের মত সুন্দর ছবিও আঁকতে পার, আবার মিকিরের মত ভয় দেখানো, বাজে ছবিও আঁকতে পার।

পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতিতে, সাদা রংকে মনে করা হয় পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতার প্রতীক। সাদা পায়রা হল শান্তির দূত। সাদা পতাকা শান্তির প্রতীক। আর কালো রং-এর সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের নানা ভয়, আছে মৃত্যুর অনুসঙ্গ। অন্ধকার রাত অথবা কালো বেড়াল দেখে ভয় পায় না, এমন মানুষ কমই আছে। কিন্তু সাদা আর কালো যখন মিলেমিশে যায়, অথবা হাতে হাত মিলিয়ে চলে, তখন যে ছবি তৈরি হয়, সেটা কেমন হয়?

আমাদের আজকের আলোচনায় তাই আমরা খুঁজে দেখব সেইসব ভাল ভাল জিনিষ, যা সাদায়-কালোয় মিশে তৈরি। দেখ তো, আমার করা এই তালিকার সাথে তুমি আরো কয়েকটা উদাহরণ যোগ করতে পার কিনাঃ



১। সাদা-কালো ছবি ও ছায়াছবিঃ এখন যদিও রঙিন ছায়াছবি বা ফিল্ম দেখতেই আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু ছায়াছবি শুরুতে ছিল সাদা-কালোই। পর্দায় ভেসে ওঠা সাদা-কালো চলমান ছবি দেখেই আমাদের সিনেমা দেখার হাতেখড়ি। সেই সাদা কালো ফিল্মেই তৈরি হয়েছে অনেক বিখ্যাত ছায়াছবি, সে হোক চার্লি চ্যাপলিন অথবা লরেল -হার্ডির মজাদার কান্ডকারখানা, অথবা ঘরের কাছে 'পথের পাঁচালী' আর 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'। 'পথের পাঁচালী' ছবিতে সাদা কাশবনের মধ্যে দিয়ে অপু আর দুর্গার ছুটে ছুটে রেলগাড়ি দেখতে যাওয়া, অথবা 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এ সাদায় কালোয় ভূতেদের নাচ সবই সাদা কালোর জাদু মাখা। আর পুরোনো হলদেটে হয়ে যাওয়া অ্যালবামের মধ্যে সাজিয়ে রাখা অনেকদিন আগের সাদাকালো ছবিগুলির সাথে জড়িয়ে থাকে কত গল্প, কত মজাদার ঘটনা। মা-বাবা বা দাদু-দিদাকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারা যায় সেই সব ছবির পেছনে লুকিয়ে থাকা মজাদার অথবা স্মৃতিজড়ানো ঘটনাগুলি।



২। প্যান্ডাঃ একে কে না চেনে? বিশেষ করে, কুং-ফু প্যান্ডার দৌলতে তো সাদা-কালো লোমে ঢাকা প্যান্ডাদের আজ সবাই একবাক্যে চেনে। মধ্য পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিম চীনে দেখতে পাওয়া যায় এই বিশেষ ধরনের ভালুকদের। এদের কানের ওপর, চোখের চারপাশে আর দেহকে ঘিরে থাকে কালো লোম। প্যান্ডাদের প্রধান খাদ্য হল বাঁশ। প্যান্ডারা বিপন্ন প্রজাতির প্রানী রূপে চিহ্নিত।



৩।জেব্রাঃ আমাদের আরেক খুব পরিচিত সাদায় কালোয় মেশা প্রানী হল জেব্রা। জান কি, প্রতিটা জেব্রার গায়ের সাদা কালো নকশা আলাদা আলাদা হয়। সেই নকশা দেখেই শিশু জেব্রা তার মা'কে চিনে নেয়। তাদের আত্মীয় ঘোড়া এবং গাধাদের মত জেব্রাদের কিন্তু খুব একটা পোষ মানানো যায় না। আর হ্যাঁ, জেব্রারাও কিন্তু বিপন্ন প্রানী। তাদের সুন্দর চামড়া অনেকের কাছেই লোভনীয় বস্তু।



৪।দোয়েল পাখিঃ পশুদের কথা বললাম, তাহলে পাখিরাই বাদ যায় কেন? চট করে খুঁজলে হয়ত খুব একটা চোখে পড়বে না, কিন্তু গ্রামের দিকে গেলে দেখতে ঠিকই পাওয়া যাবে সাদায় কালোয় মেশা এই পাখিটাকে।



৫।পেঙ্গুইনঃ আমাদের আরেক সাদা-কালো বন্ধু হল পেঙ্গুইন। দুইদিকে হাত ছড়িয়ে দুলে দুলে বরফ মাড়িয়ে চলা এই পাখীকে কে না চেনে? যদিও এদের আদত বাস আন্টার্কটিকা অঞ্চলে, কিন্তু এদের কিছু কিছু প্রজাতিকে এমনকি নিরক্ষরেখার আশেপাশেও দেখতে পাওয়া যায়।



৬।জেব্রা ক্রসিংঃ জেব্রা নিয়ে কথা হয়েছে যখন, তখন জেব্রা ক্রসিং কে বাদ দিই কি করে? রাস্তা পার হওয়ার সময়ে সাদা-কালো দাগের ওপর দিয়ে হাঁটার অভ্যাস নিশ্চয় আছে তোমার। জেব্রার গায়ের মত সাদা কালো বলে পথের এই অংশটুকু জেব্রা ক্রসিং নামে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পথচারীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করা হয়।

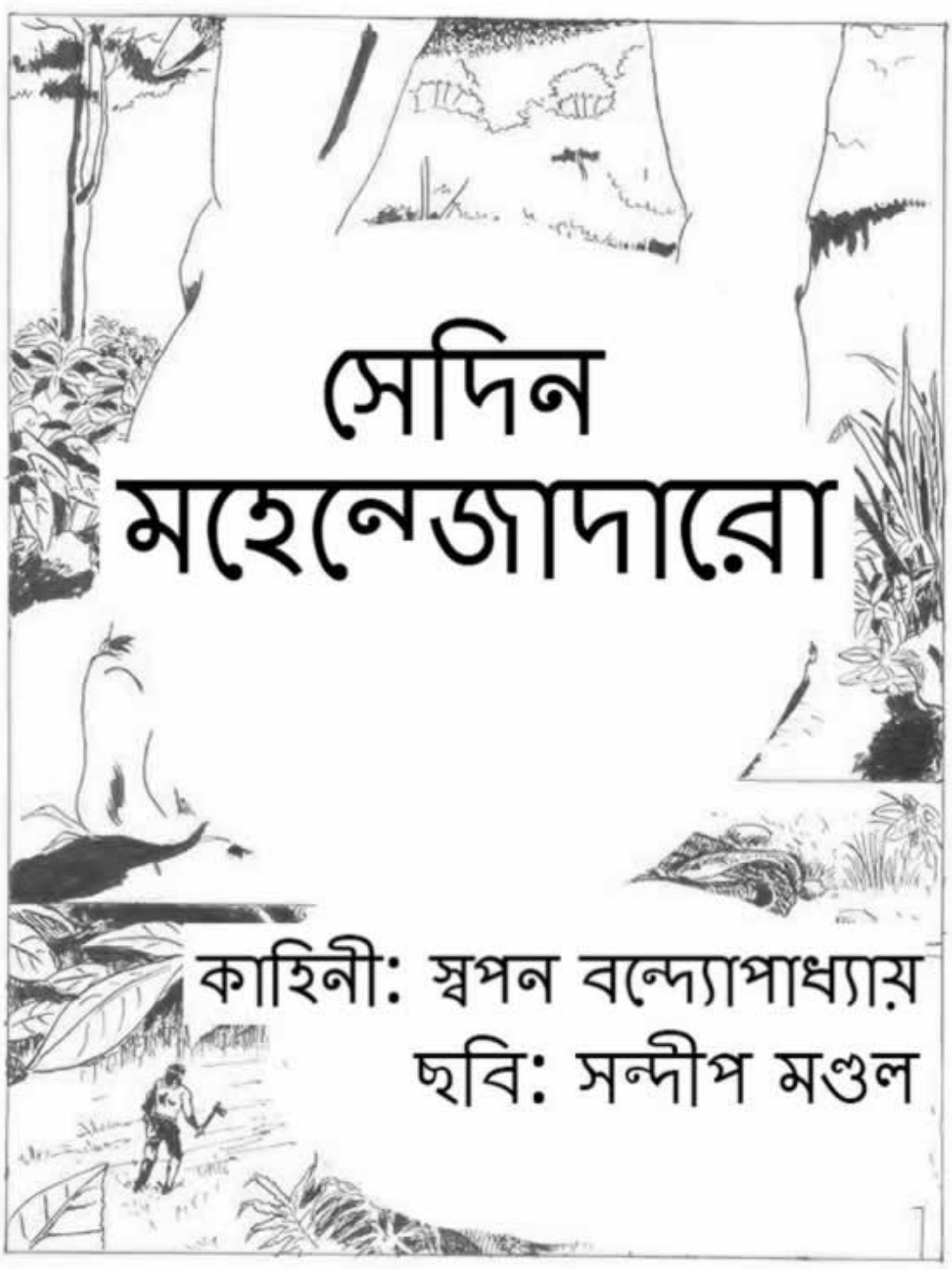
আরো দুয়েকটা বলব নাকি? ঠাকুমার মাথায় সাদায়-কালোয় মেশানো চুল, অথবা জলখাবারের থাকায় ডিম পোচের পাশে নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো। নিত্যদিনের জীবনে চোখে পড়বে ভালো ভালো সাদা কালোর এহেন হরেক উদাহরণ।

সেইসব নিয়ে নাহয় আলোচনা হবে অন্য কোন এক সময়ে, কেমন? আজ এই পর্যন্তই থাক।

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলি, কলকাতা

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া
দোয়েলপাখির ছবিঃ
অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কমিক্স: সেদিন মহেঞ্জোদারো




ঘোর জঙ্গলের মধ্য
দিয়ে হেঁটে চলেছে
বিনায়ক
কোথায় তার গন্তব্য ???
জঙ্গলের পদে পদে
বিপদ সঙ্কুল.
এখানে পায়ে পায়ে বিপদ


প্রতি মুহূর্তে বিপদ
আমেক টা বিনায়কের নিজের জীবনের মতই
কিন্তু বিনায়ক ভয় পায় না
অতিক্রম করে চলে সব বাধা বিপত্তি
এক দিন গাছের ডালে বিশ্রাম-রত অবস্থায়
বুঝতে পারে সে কি ঘটতে চলেছে


হঠাৎ
প্রতিশোধ, আমি নেবই মা
ঈশ্বা বাবা, জম্বুকই তোর বাবার হত্যাকারী, মায়েরাদারের এক থেকে পালিয়ে অনেক আসুর নিয়েছি ওর হাত থেকে বাঁচতে, ওকে থেকে বদলা নিতেই হবে,
মায়েরাদারের বর্তমান শাসনকর্তা
জম্বুকের অত্যাচারের কথা আজও এখানে মেখের আমনে জল ছলছল করে


তোর বাবা ছিলেন মহেন্দ্রোদাড়োর অন্যতম পুরাণ স্থপতি। সিন্ধুদেশে বাঁধ নির্মাণের দায়িত্ব ছিল তাঁর।
তবে নদের প্লাবনের জন্য বাঁধ থাকলেও অন্য এক প্লাবনের কোন বাঁধ ছিল না।
অত্যাচারের প্লাবন
তোর বাবা সেখানে ও বাঁধ দিতে চেয়েছিলেন তার ফলেই চলে যেতে হল তাঁকে
নিঃসম্বল অবস্থায় তোকে নিয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলাম এই জঙ্গলে।
জঙ্গলের সর্দার আমাদের আশ্রয় দিলেন
এখানে তোদের কোন ভয় নেই। বিনাকে শিকার ব্যবস্থা ও আমিই করব। তুই যে আমার মেয়ের মত।
শুরু হল তের তপস্যা


অন্যের প্রতিপালিতের ডাক সকলে করলি প্রতিকার
দিনে দিনে বড় হলি তুই
এবার তোর সময় হয়েছে প্রতিশোধ নেবার পারবি তো বাবা?
থ্যাঁ মা পারতে আমাকে হবেই
দিন কয়েক পর
এটাই কি সিন্ধু নদ?
অকস্মাৎ
দূরে দেখা গেল দুটো পাল তোলা নৌকা
এগিয়ে আসছে তারা—


নাদ্দি ভাই - ও মাঝি ভাই – এটাই কি সিন্ধু নদ ?
হ্যাঁ, এটাই সিন্ধুনদ। তুমি কোন দেশের মানুষ ভাই – সিন্ধু নদ চেনো না, যাবে কোথায় ?
যাব মহেঞ্জোদাড়ো পথ হারিয়েছি, যাব কোন পথে ?
নদী ধরে উত্তরে যাও সোজা তিনেক, একটি ফেরিঘাট পাবে, সেখানেই মহেঞ্জোদাড়ো।
আবার শুরু হল পথচলা
অবশেষে পৌঁছাল ফেরিঘাটে


'মহেঞ্জোদাড়ো'র প্রবেশ দ্বারে
কিন্তু বিনায়কের জন্য দোরগোড়া খোলা
উপায় নাই, কি করবে ও এখন?
বাইরে পায়ে দাঁড়ানো
তো ভিতরে ঢোকা
অসম্ভব।
কি করা যায়?
ঢুকতে আমাকে হবেই
রাত্রির অন্ধকারে
না:, এভাবে
সম্ভব নয়।


বার বার দুর্গা গুহা
এক সময় —
বাঁচাও বাঁচাও
বাঁচাও
বাঁচাও
শহীদের
গহনা গুলো ছাড়
নে .
বাচাও-বাঁচাও
এখানে চিৎকার
করে কোন লাভ
হবে না .
মনে হচ্ছে
এটাতে খাবার
আছে .
ষাঁড়ের শিং থেকে বাচিয়ে
একটি লোকের সর্বস্ব
লুট করছে দস্যুরা , কিন্তুকে
কি পারবে এত গুলো দস্যুর
হাত থেকে লোকটিকে বাঁচাতে ?


এত পুলো ফেলে
বর্বরের সঙ্গে লড়তে
যাওয়া বোকামি হবে,
অন্য ব্যবস্থা করি,
ওদের বরং সিংহ-
নিনাদ শোনাই,
হা
হা-আ-আ
হা-আ-আ
হা-আ-আ
পালাও
পালাও
পালাও
পালাও
আমাকে ছেড়ে
দেওয়া,
গরর্
উঁউন উঁউন
কোন জন্তু নেই,
দস্যুরা পালিয়েছে


সম্বিত ফেরার পর
আ - আপনি কে ! সিংহ কি পালিয়েছে !
সিংহ এখানে আসেনি, আমি ঐ শব্দ করেছিলাম দস্যুদের তাড়াতে. কিন্তু আপনি কে ! কোথায় যাচ্ছিলেন এই সন্ধ্যেবেলা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে .
আমি ভুলুনাগ . থাকি কালিবন্দর নগরে . ওখানকার পরিষদপতি অর্বুদের শ্যালক আমি , যাচ্ছিলাম মহেন্দ্রোদাড়োতে . পরিষদ -পতি জম্বুকের আমন্ত্রণে সিংহরাজের পুজায় যোগ দিতে . সঙ্গে রসদপত্র ছিলো . চাকপথে চড়াও হয়ে তারাই উপহার সামগ্রী লুণ্ঠন করে ,... পায়ে আমার গোদ . দয়া করে একটা আমায় দেয় . তাই খালিহাতেই নিঃসঙ্গ রওনা করতে যাচ্ছিলাম .....
তারপর পরশায় এই দস্যুদের জবলে , তুমি না থাকলে আমাকে প্রাণটা যেত ...
কিন্তু আমার যন্ত্র তো নেই , পায়ে গোদ নিয়ে কিভাবে পৌঁছাব মহেন্দ্রোদাড়ো ?!
নগরদ্বার পর্যন্ত আমিই আপনাকে পৌঁছে দেব .
কেন , নগর দ্বার পর্যন্ত কেন চলো তুমিও আমার সঙ্গে মহানগরে উদ্যমে যোগ দেবে . তোমার অদ্ভুদ কারুকলা তুমি প্রদর্শন করতে পারবে -
সুযোগ টা কাজে লাগাই
আমি নিশ্চিত ও - বিদ্যা আর কেউ জানে না , জম্বুক খুব খুশি হবে . তুমি ও পরিতোষক পাবে .
আমি প্রস্তুত - আপনি আমার কাঁধে চড়ে বসুন .


চল আবার নামার আগে পৌঁছানো দরকার।
কালবৈশাখী থেকে আসছি এই আমার পরিচয় পত্র
অভ্যাগতম ... আপনাদের দুর্গে পৌঁছানোর জন্য গাড়ির ব্যবস্থা আছে — ভিতরে আসুন,
আসুন, গাড়িতে উঠে বসুন।


ড্রাইভার, আমার একটু বিশ্রামের দরকার —
আপনি বিশ্রাম নিন, আমি একটু বাদে ফসল কাটি
এখানে তো দেখছি সবকিছুই বেশ আদিম।
এটা আদিবাসী এলাকা, এই পথ দিয়েই আপনাদের নিয়ে যাওয়ার হুকুম আছে।
নগর জীবনে তোমরা তো কেউ আলোই আছো
না গো বাবু, আমরা এখানে আছি পশুর মতো আমরা মানুষ নয় গো বাবু
এই যে সব দেখছেন সবই আমাদের মত গরীবের রক্তে তৈরী।


কথাবেন, এমন কথা যেন কম্বুকের কানে না যায়, তাহলে আমার প্রাণটি যাবে।
জম্বুক!
হ্যাঁ, ব্যবসায়ীদের পরিশ্রমলব্ধ কম্বুক ও প্রবল পুরোহিত উদ্যবক এই ইচ্ছায় দেশের আইন।
প্রভুর, এই যে শিবরাজের উদ্যম উৎপাদনে আপনারা চলেছেন তার আয়োজন, খানদিনা সবই আমরে আমাদের মত সাধারণের উপর ধীরনের বিনিময়ে। আপনারা এসব বুঝতে পারবেন না।
ঘন্টা খানেক পর ঘুম থেকে উঠে
ওমা! কি সুন্দর দুর্গ, এমনটি জীবনে কোনদিন দেখিনি, দেখে জীবন সার্থক হল। আমার ওপ্রিশক্তির সাধ্যিও হবে না এমন একটি খানদানি দুর্গ বানাতে।


ঢ্রীম...ঢ্রীম...ঢ্রীম
ঢ্রীম ঢ্রীম ঢ্রীম
আসুন অতিথিরা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমাদের পুরোহিত মশায় উদ্ধবক এখনই কুমারী পূজা শুরু করবেন। বাবা লিঙ্গরাজের কাছে আমাদের প্রার্থনা বিরাট শস্যশালিনী করুন।
ঝম ঝম ঝম
ঢ্রীম ঢ্রীম ঢ্রীম
শুরু হল কুমারী পূজা


এবার এই কিশোরীকে গিরিরাজের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হবে।
আপনারা তৈরী হন রক্তহোলির জন্য।
তুমি ভাগ্যবতী মা, এবার গিরিরাজের নৈবেদ্য হতে চলেছ।
তৈরী হও
ঝম ঝম
শ্রীম শ্রীম শ্রীম
ঐ নিষ্পাপ মেয়েটার রক্ত নিয়ে চলছে খেলিখেলা, মা — তোমার কথা মনে পড়ছে বারবার
উঃ কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা


পরদিন শুরু হল বিচিত্রানুষ্ঠান,
নানা অনুষ্ঠানের পর এল বিনায়কের সুযোগ।
হে পারিষদ-পতি অনুমতি করুন কলিঙ্গদেশের পক্ষ থেকে বিনায়ক তার কলাকৌশল প্রদর্শন করুক।
শুরু কর বিনায়ক
বিনায়ক শুরু করল তার ভর-বেলন বিদ্যার প্রদর্শন —
এমনটা কখনও পুথিনি- অপূর্ব
অপূর্ব
সত্যই বিনায়ক আমি অভিভূত তোমার অদ্ভুত ভরবেলনে
তুমি ইচ্ছামত পুরস্কার প্রার্থনা করতে পারো।
পুরস্কার!!! আমার পিতৃকুলের কাছ থেকে ?
আপনি যদি সত্যিই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে আমাকে এই সভার সভাকবি থাকবার অনুমতি দিন।...
সেইসঙ্গে আপনার নগর স্বাস্থ্য বিভাগে যে কোন একটি কর্ম মঞ্জুর করুন।


খুব চেনা চেনা লাগে বিনায়ক কে!!
নগর স্থাপত্যের কাজ কি তুমি জান?
আশাকরি হাতে কলমে কাজ শিখেই শিখে নিতে পারব, প্রভুর যা ইচ্ছা তিনিই আমাকে বিচারিত করবেন।
আশ্চর্য, কি বিচিত্র এই বিনায়ক, কেরালাময় একটা চাকরী চায়।
বেশ তাই হবে, তোমায় আমি পান্ডার নগরীর শ্রেষ্ঠ স্থপতি অম্বুবাহা-র কাছে কিছু কালের জন্য পাঠাবো
আশা করি এই সময়ের মধ্যে তুমি তোমার কৃতিত্ব দেখাতে পারবে। এছাড়াও তোমার অন্য কাজ হবে প্রয়োজনমত সভায় উপস্থিত হয়ে তোমার আশ্চর্য্য শব্দ প্রক্ষেপন বিদ্যা প্রদর্শন করা।
স্থপতি বহুকালের পরিচিত সভাস্থ
খুব পরিচিত লাগে, কোথায় যেন দেখেছি একে।
বাবা, কি নাম তোমার? কে তোমার পিতা?
আমি বিনায়ক
দেখে মনে হচ্ছে একে পিতার নাম বলা চলে।
পিতা সত্যনাম
সত্যনাম !!
তোমার পিতা সত্যনাম ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু, তার মৃত্যুর পর অনেক সন্ধান করেও তার পরিবারের কোন খবর পাইনি, আজ ঈশ্বরই তোমায় আমার কাছে এনে দিয়েছেন।
বাবা, ওকে ভিতরে নিয়ে এস


মা, এ আমার বন্ধু সত্যজিৎ ছেলে। আমার কাছে কাজ শিখবে, ও আমাদের সাথেই থাকবে।
বাবার কাছে আপনাদের কথা অনেক শুনেছি। এতদিন কোথায় ছিলেন?
এখানে থাকলে নিশ্চয় প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতাম না, আপাতত বুঝতে পারছ এতদিন পর আমার আসার উদ্দেশ্য।
অনুমান করছি, বাবার কাছে তোমার শেখা নিশ্চয় সঠিক উদ্দেশ্য নয়।
না, বাবার হত্যার প্রতিশোধ আমার নিতেই হবে, সেই কারণেই আমি এসেছি। আমার শেষ ইচ্ছা ছিল এটাই।
মায়ের শেষ ইচ্ছা আপনাকে পূরণ করতেই হবে, এতদিন আমাদের পাশে যে কি কষ্টে আছে!! বাবাকে ওদের প্রয়োজন, তাই আমরা এখনো বেঁচে আছি।
নিশ্চয় ঈশ্বর তিনি আমার সহায় আছেন, নইলে এত সহজে তোমাদের সাথে দেখা হয়!
আমরা আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব।
আমি একটি সংগঠন তৈরী করেছি যার উদ্দেশ্য মানবতাবাদী-সংস্কৃতি চর্চার ঐতিহ্য কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা,
আমাদের সংগঠন আপনাদের সর্বোচ্চ সাহায্য করবে।

শুরু হল বিনয়কের মধ্যেদ্যোগের বাস, অমুকালের কাছে শেখে শপথ নিয়া, 'স্বরক্ষেপন' প্রদর্শনে মাঝে মাঝে যেতে হয় তাহুকের সভায়, সেদিকে মনে জাগছে প্রতিশোধ স্পৃহা, প্রেরণা-দায়ী রূপে পায় 'স্ত্রী' কে,

একদিন ভোরে

কি আশ্চর্য! বারবার একই স্বপ্ন দেখি

মা বারবার দেখা দেয় স্বপ্নে

প্রতিশোধ আমি নেবই মা, শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছি,

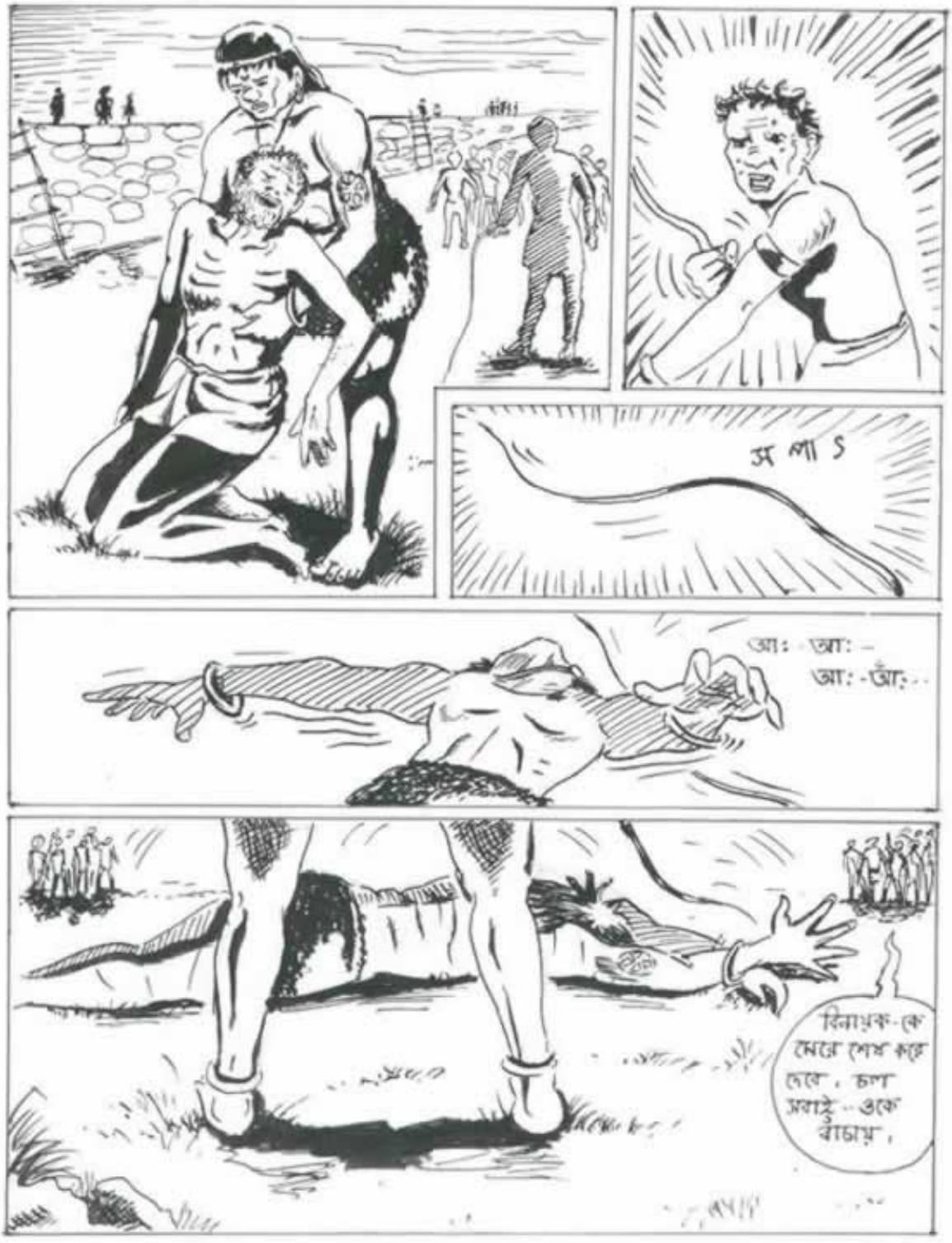
কাজ শেষার সাথে সাথে চলে জনসংযোগ

দিন কয়েক বৃষ্টির পর, একদিন সিঙ্গুনদের কূল উঠাল ফোঁসে, রাত-দিন বাঁধের কাজ করে যায় শ্রমিকের দল,

আর পারছি না মা, সারাদিন না খেয়ে এত পরিশ্রম সহ্য হয় না,

আমাদের মত দাসেদের দুর্দশা কবে যে ঘুচবে...


তবে রে
ম-র্ক-ট
ম-ম-ম-স-
মশলা বন্ট করাচ্ছি
ধিক্ শতধা করে না
আরাদিন অদ্ভুত এই
বৃদ্ধ মানুষটার পিঠে
চাবুক চালাতে
দুঃ
ধ্ব ক


স পা S
আঃ -আঃ -
আঃ -আঁঃ..
বিনায়ক-কে মেরে শেষ করে দেবে, চলা সবাই -ওকে বাঁচায়,


চলো সবাই
না না - এ চলতে পারে না, চলো সবাই।
বীরাই দাস বিদ্রোহের খবর পৌঁছাল জম্বুকের কাছে।
বিদ্রোহী দের নিকেশ করো, ভাসিয়ে দাও ওদের সিন্ধু-নদের জলে।
শুরু হল হত্যালীলা। শত-শত বিদ্রোহী দাসের রক্তে রঙিন হল সিন্ধু নদের জল। তখন কি রক্ষা পেল না বৃদ্ধ অম্বুকাল-ও। সরকারী কাজে বাধা দান ও দাস শ্রমিকদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করার অপরাধে তাঁকে হত্যা করা হল। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেল বিনায়ক। কিন্তু সে কতদিন?


প্রী-র শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে বিনায়ক ।
... কিন্তু আমি বেঁচে উঠলাম কি ভাবে ?
মৃত দেহের স্তূপের মধ্য থেকে তুলে এনেছি তোমাকে, মৃত থেকে তোমায় ফেলে দিয়েছিল।
মহেঞ্জোদাড়ো-র মানুষ জেগে উঠেছে। ওরা তোমায় সার্বভৌ ভাবে। সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ তোমাকে নিতেই হবে, --বিনায়ক ।
হঠাৎ একজন খবর দিল
সর্বনাশ হয়েছে, আপনি এখনই পালান, জম্বুক জানতে পেরেছে আপনি উপস্থিত, ওরা এখানে আসছে ।
আঁ... অ্যাঁ ....
ঝ ন ন ন
এই তো পেয়েছি বিনায়ক কে
বিনায়ক কে নিয়ে চলল জম্বুকের কাছে ।


এতদিনে তোমায় চিনেছি বিনায়ক। তুমি সত্যনামের পুত্র। বিশ বছর আগে সত্যনাম ত্রিপুরা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু।
জন্মুক তার শত্রুর স্মৃতিকেও ক্ষমা করে না।
প্রহরী রা — কঠোরতম শাস্তি দাও এই নরাধম কে। যাও॥
তোমার রক্তমুণ্ড শৃঙ্খলায়িত করে জনমানবহীন প্রান্তরে ফেলে রেখে বিনায়ক কে, ও তিলে তিলে করে দাড়া পরবে জঠোরের জ্বালায় অথবা হিংস্র শ্বাপদের জঠরে ঠাঁই নিয়ে .....
মা, তোমার ইচ্ছা তুমি আর পূরণ করতে পারলাম না। দু দিন ধরে একাবেলে পরে আছি।
সব আশা কি তবে শেষ?


ঙ্ক উ উ
অক্ অক্
ঙ্ক - উ - উ
কখনও ছুটে আসে বন্য কুকুর, কখনও হিংস্র সিংহের দল, শব্দ প্রক্ষেপণের সাহায্যে কোন মতে বিতাড়িত করে তাদের।
কিন্তু এভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকা যাবে, দিন দিন শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে।
হঠাৎ!
মৃত্যু নেমে আসে আকাশ হতে
ফি অ্যা-ফি-ফি
আমার সময় বুঝি শেষ হয়ে গেল, শব্দ প্রক্ষেপণেও কাজ হচ্ছে না।


এ কি করে সম্ভব ! তীরটা পাখিটা ধরল কি ভাবে ?
এ কি অদ্ভুত জীব ! মানুষটা ও অন্য রকম, রঙ খুব ফর্সা, ঘোড়ার থেকে অনেক হালকা পরা, ও ই কি আমায় বাঁচালো ?
কে তুমি ?


তোমার এই অবস্থা হল কি ভাবে ? কি নাম তোমার ?
আমার ভাষা ও বুঝতে পারছে না, ইঙ্গিতে তোমাদের কথা বলছি। আমার ইচ্ছাতে তরবারি দিয়ে ওকে বন্ধন মুক্ত করি।
বন্ধন মুক্ত করে ইঙ্গিতে আগন্তুক তার নাম জানাল - 'পুরুধ', জাতিতে আর্য, বিরাম উত্তরের পাহাড় প্রান্তরের ওদিকে, সৈন্যরা এসে পড়েছে এখানে, তার সাথে থাকা কুকুর নাম - 'অশ্ব', বিনায়ক-ও নিজের নাম জানাল আগন্তুক কে, তারপর আলিঙ্গন করে বরণ করল নতুন বন্ধুকে, পুরুধের কথাতে বিনায়ক উঠে বসল তরুণদ্ব ঐ প্রাণীটির উপর- যার নাম অশ্ব, দুজনকে নিয়েই উত্তর পাহাড়ের এক সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়ে ছুটে চলল অশ্ব ও কুকুর, বিনায়কের জীবনে সুরু হতে চলেছে এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় ———


আর্য জাতির সুরগোষ্ঠী অসুরগোষ্ঠীকে পরাজিত করে ফিরে আসছে,
জয় সুরশ্রেষ্ঠ শতক্রুর জয়
জয় সুররাজ ইন্দ্রের জয়
প্রণাম গুরুদেব
কি সংবাদ ইন্দ্র
আপনার আশীর্বাদে এবার যুদ্ধে আমরা অসুরবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করেছি,


তারা পলায়ন করেছে পশ্চিম পর্বত সীমা অতিক্রম করে, আশা করা যায় এবার থেকে আমাদের গোধন এবং পালিত পশুগুলি নিরাপদ হবে।
কেবল অসুরদের শত্রুতাই নয়, এখানকার মাটি বাতাস ও তার আমাদের জীবনধারণের উপযুক্ত নেই, নতুন ভূখণ্ডে আমাদের পৌঁছাতেই হবে। ওই বিশাল তুষার ধবল পর্বতশ্রেনীর দক্ষিনে আছে সুজলা, সুফলা, শষ্য-শ্যামলা এক বিশাল উপমহাদেশ,
যেখানে আছে নদী, গোচারণ ভূমি আর অসংখ্য গবাদি পশু।
কিন্তু মন্ত্রির যে দেশের অস্তিত্বের কোন প্রমান তো নেই। উপযুক্ত প্রমান পেলে আমরা অগ্রসর হব।
প্রমান এবং পথের নিশানা দুই মিলেছে। পূজন যে সন্ধান নিয়ে এসেছে। প্রধান বলে
বিনায়ক
চলো তার সাথে সাক্ষাৎ করি
এদিকে আর্যগৃহে বিশ্রামরত অনার্য নায়ক বিনায়ক
এই সুযোগ, এদের সাহায্য নিয়েই পরাস্থত করব কুকুরকে। বাঁচবে মহেঞ্জোদাড়ো-র মানুষ।
সুরক্ষিত পূজায়ের অনেক রিস্ময়কর গুনের মধ্যে একটা হল মানুষের মনের কথা বুঝতে পারা, তাই তাদের কোন বাধা হয়ে দাঁড়াল না।
কি বিনায়ক কেমন আছ? সুস্থ তো? এবার তবে রওনা হতে পারি তোমাদের দেশে।


আমি প্রস্তুত, অম্বুকের মত অত্যাচারী শাসক কে বিতাড়িত করতে আপনারা পারবেন, কাল প্রভাতেই যাত্রা শুরু করা যাবে
পরদিন প্রভাতে আর্যরা এগিয়ে চলল নতুন দেশের সন্ধানে
লক্ষ লক্ষ বিরে চলল অনার্য বীর বিক্রমে
হে সুরেরাজ ইন্দ্র, এই নদীর অপর পারেই মাহেজোদাড়ো নগরী, আমাদের এখানেই শিবির স্থাপন করা উচিত
কাল প্রাতে শুরু হবে অভিযান, কিন্তু তোমার সাহায্য চাই ...
পুরুষ আমাদের প্রধান সেনাপতি
হে ইন্দ্র, পুরুষ আমার প্রাণ রক্ষা করেছে তাকে আমি সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত,
বিশাল এই ভূভাগে বাস করে আভীর, যদু, গন্ধর্ব আরো অনেক অরণ্যচারী সম্প্রদায়ের মানুষ, তার সাথে মানুষ যুক্ত হবে নতুন জনগোষ্ঠী – আর্য, সেই সঙ্গে মাহেজো – দাড়োর প্রতিষ্ঠিত হবে সুশাসন,
মানুষ আভীর নিষাদ এদের সেটাই বা কম কি?


শুরু হলো যুদ্ধ। ময়যুদ্ধ। কিন্তু সফল হলো না প্রস্তর প্রাচীর ভেদ করে মহেঞ্জোদাড়ো-তে প্রবেশ করা।
শোনো সৈনিকগণ। এভাবে মহেঞ্জোদাড়োতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। প্রতিদিন আমাদের হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বরং নিকটবর্তী অন্য অনার্য নগরগুলো আগে দখলে করো। পর্যাপ্ত সৈন্যসমাবেশ করে পরে অন্য উপায় ভাবা যাবে।
শুরুহল অনার্য নগর গুলোর উপর আর্য আক্রমন। পুড়িতেছে। বিধ্বস্ত অনার্যরা পরিণত হল দাসে। রক্ষা পেল না অনার্য নারী রা-ও....
এ কি গুরুহল গুরুদেব। আপনারা বিদেশের সভ্য বলে পরিচয়দেন কিন্তু এ কি বর্বরোচিত আচরণ? জম্বুকের অত্যাচার রুখতে না পেরে আপনারাই অত্যাচারী হয়ে উঠলেন।
বিনায়ক উত্তেজিত হয়োনা, আমার দিকে তাকাও —
সম্মোহিত বিনায়ক
এ কি এ কি... হচ্ছে আমার। আমি যে ...সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি গুরুদেব এ আপনি কি..... বলুন গুরুদেব কি জানতে চান?
বর্মা আগত। তুমি আমাকে বল বীর্যের দুর্বলতম অংশ কোনটি?


সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শি পুরুষের পক্ষে কঠিন হল না বাঁচের দুর্বল জংশের খবর নেওয়া। (বাঁচের দুর্টিনাটি জানতে বিনায়ক।)
পরের ঘটনা তো — ইতিহাস
বন্যায় ভেসে গেল মহেঞ্জোদাড়ো নগরী
এ আমি কি করলাম। জংশুক কে পাঠি দিতে গিয়ে আমার জন্য সমস্ত নগরী ধ্বংশ হল। — মা এখন আমি কোথায় যাব? স্ত্রী — শ্রীও বিষিয়ে ভেসে গেছে বন্যায়।


বন্ধু বিনায়ক, তুমি এত বিষন্ন কেন? আজ তো আনন্দের দিন, জম্বুক সম্রাট-রূপে পরাহত। আর তোমার জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই জয়ের নায়ক তুমিই।
না পুষন, আজ মিত্রের উপর আমার রাগ হচ্ছে। আমার ভুলে এত বড় সভ্যতা ধ্বংশ হয়ে গেল। এ আমি সহ্য করতে পারছি না।
এখন তোমাদেরও বর্বর বলে মনে হচ্ছে।
না পুষন, তোমাদের সাথে থাকতে পারব না।
আমি, আমার অনার্য ভাইদের সাথেই থাকতে চাই
বিনায়ক শোনো বিনায়ক
বিষন্ন বন্ধু বিদায়
বিনায়ক কি তবে মেরে গেল?

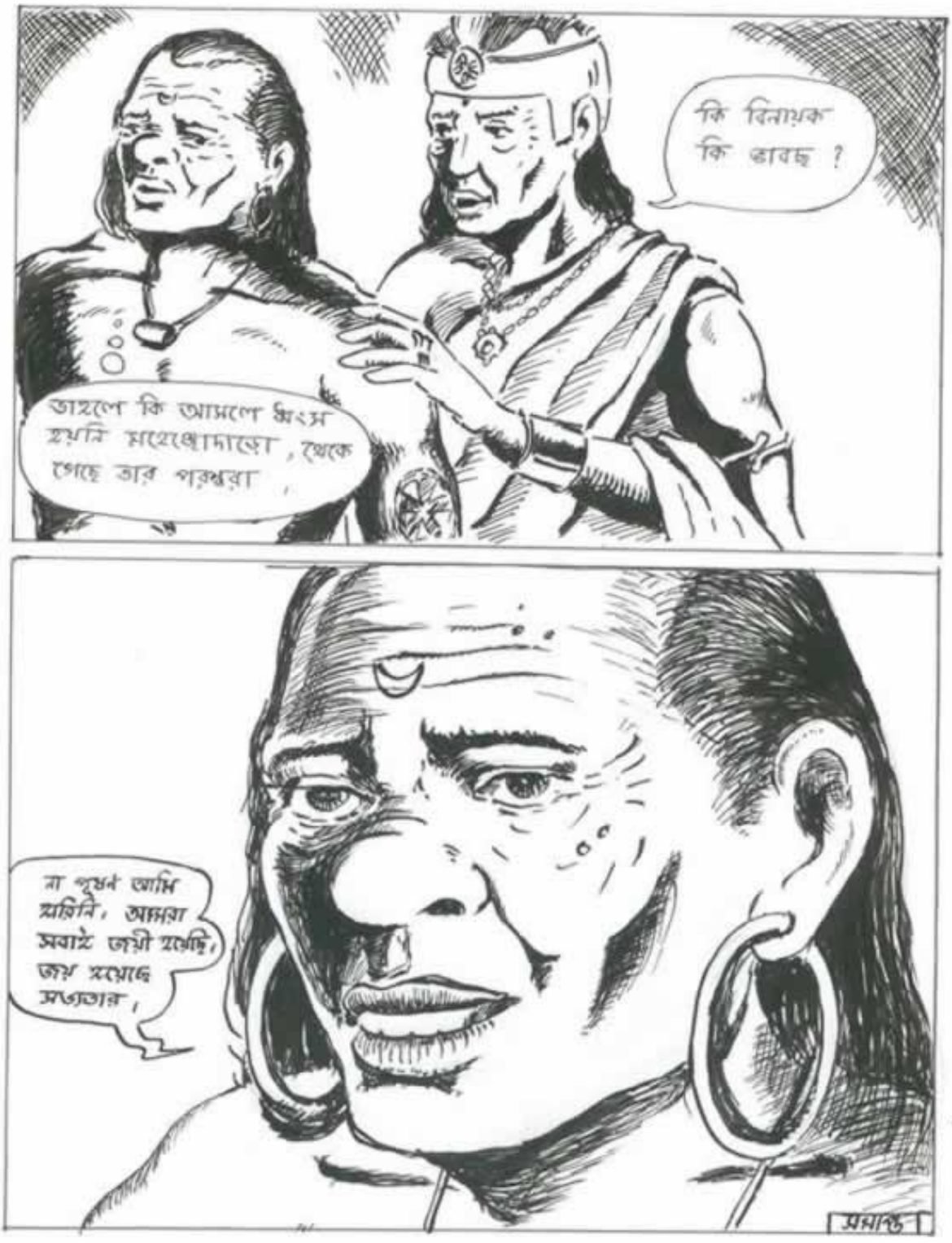
তারপর । তারপর কেটে গেছে বিশ বছর, উপমহাদেশের সপ্তসিন্ধু বিধৌত উত্তর অঞ্চলে আর্য অধিকার প্রথম ক্রমেই সুপ্রতিষ্ঠিত, গতিশীল অশ্ব, কঠিন লৌহ নির্মিত অস্ত্র আর বিপুল সামরিক বলে বলিয়ান এই নতুন আগন্তুক গোষ্ঠী একে একে ভঙ্গ করছে সমস্ত অনার্য শক্তিকে।

কিন্তু লড়াই সম্বলও চলছে বলে জানা গেল। আর্যদের পুরুহুমাত্র নগর সভ্যতার ধারকদের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হচ্ছে না– চোরাগোপ্তা লড়াই চলছে অরণ্যচারী অনার্যদের সঙ্গে, এইসব ছানছাত বিতাড়িত অনার্য দস্যুরা সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্য বাহিনীর ওপর।

সিন্ধু সভ্যতার সাম্রিধ্যের প্রথম ঢেউ পুখনের ওপর, সুশাসক মে, একদিন তারই হাতে ধরা পড়ল এক অনার্য দস্যুদল। তাদের নায়ক অতি হিংস্র এবং কৌশলী, অনার্য হলেও যে অশ্ব চালনায় পারদর্শী, তাকে আনা হল পুখনের রাজসভায়।




আমি হেরে গেছি পুরুধ, আমি হেরে গেছি
যদু আমি তুমি তোমার বুকের ব্যাথা, অনার্য শাসন নেই বটে তবে তুমি যা চেয়েছিলে সেই সুশাসন তো মহেঞ্জোদাড়োতে প্রতিষ্ঠিত। আর্য অনার্য মিলে মিশে এক নতুন সভ্যতা শুরু হয়েছে।.... চলো তুমি আমার অন্দর মহলে আজ ও তোমার কথা মনে রেখেছে একজন।
ওমে ...'শ্রী'
শ্রী?!!
অন্দর মহলে
খুল্লতাত কে প্রনাম কর জয়ন্ত, মরমা
একি শ্রী - এ তো অনার্যরীতি
তাছাড়া আর্য স্ত্রীরা হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর ... এ ও তো অনার্য রীতিরই প্রকাশ।


কি বিনায়ক
কি ভাবছ ?
তাহলে কি আসলে ধ্বংস
হয়নি মহেঞ্জোদাড়ো , থেকে
গেছে তার পরম্পরা ,
না পুষন আমি
হারিনি , আমরা
সবাই জয়ী হয়েছি ,
জয় হয়েছে
সভ্যতার ,
সমাপ্ত

মজার পাতা



বলো তো দেখি কী –

১. একে চারে পর্ব তীজ, একে দুইয়ে বাণ,
মাথা কাটো আন্দাজের, শেষে পাবে স্থান।

২. মধ্যেতে রাখিয়া পা, শ্রীকৃষ্ণ সন্মুখে,
আদি অন্তে বড় গোল, তিনে কারে দেখে?

৩. চারটি অক্ষর, পরা একে তিনে জাগে,
প্রথমার্দ্ধে জানোয়ার, নরপতি শেষ ভাগে।

৪. তিনবর্ণে মৎস্য শ্রেষ্ঠ, অপূর্ব স্বাদেতে,
ইশ... দেখি পেট নেই, পারো কি বলিতে?

৫. যোগহীন রাজযোগ, শেষার্দ্ধেতে বাট,
চারে সুপ্রশস্ত, চলে গাড়ী, ঘোড়া, ঠাট।



উত্তরমালা---

১. তীরন্দাজ

২. গোপাল

৩. পশুরাজ

৪. ইলিশ

৫.রাজপথ।

অধ্যাপক (ডঃ) জি. সি. ভট্টাচার্য্য,
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়,
বারাণসী, উত্তর প্রদেশ

শীতের গপ্পো



আবার তো জাঁকিয়ে পড়লো শীত। কেমন মজা করছো ইচ্ছামতীর ছোট্ট বন্ধুরা? ছোটবেলায় শীতই ছিল আমার ফেভারিট ঋতু। নভেম্বর আসতেই হাড় কাঁপানো উত্তুরে হাওয়া, ছুটির দিনে দুপুরবেলায় জম্পেশ ভুরিভোজের পর জানলার ধারে একচিলতে রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে দিয়ে সুর্যিমামার গরম ওম নেওয়া এর মজাই আলাদা! রবিবার আমাদের হাউসিং কমপ্লেক্স-এর চত্বরে সকাল থেকেই আসে একে একে ফেরিওয়ালা।শীতের রবিবার তার সঙ্গে যোগ দেয় জয়নগরের মোয়া, নলেনগুড়ের পাটালি - ওঃ, ভাবতেই জিভে জল! আর শুরু হত ক্রিকেটের মরশুম। তখনো এমন বারোমেসে ক্রিকেটের রমরমা হয়নি কিনা! তাই শীতে টিভিতে ক্রিকেট দেখা আর গলিতে ইঁটের উইকেট পেতে রবারের বল পেটানো ছিল শীতের স্পেশালিটি! আর ব্যাডমিন্টন তো ছিলই।বড় দাদারা আবার নেট, লাইট লাগিয়ে হিম পড়া রাত্তিরে খেলত।যতদূর মনে পড়ছে- ক্লাস থ্রী কি ফোর অবধি আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা হত ডিসেম্বরে।জানুয়ারি থেকে নতুন ক্লাস। তাই বড়দিনের ছুটির আট-দশদিন ছিল আমাদের কাছে বছরের সেরা ছুটি।গরমের বা পুজোর ছুটি লম্বা হলে কি হবে, হোমটাস্ক, পড়া, স্কুল খুললেই পরীক্ষা ইত্যাদি নানান ভীতি! আর বড়দিনের ছুটি মানে নিখাদ মজা।

অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হলেই কু-ঝিকঝিক রেলের গাড়ি চেপে (সত্যিকারের কয়লার স্টীম ইঞ্জিন!) গ্রামের বাড়ি যাওয়া। আর গ্রামেগঞ্জের শীত মানে জানো তো - কলকাতার দুদিনের সৌখীন শীত তার কাছে নস্যি। সুর্যিমামা ডুব দেওয়ার সাথে সাথেই যেন কালো চাদর মুড়ি দিয়ে চুপিচুপি নেমে আসতো শীতবুড়ি। সন্ধে হতেই মা, কাকিমা, ঠাকুমা, খুড়তুতো - জ্যাঠতুতো ভাইবোনেদের নিয়ে রান্নাঘর হাউসফুল।গরম গরম চা, মাটির উনুনে কয়লার আঁচে সেঁকা ফুলকো রুটি কিংবা খাঁটি সর্ষের তেল মাখা বাটিভর্তি ঘরে ভাজা মুড়ির সাথে চলতো জমাটি গপ্পো। তোমরা কি কেউ কয়লার বা কাঠের আঁচের উনুন দেখেছ? হয়তো সত্যিই কিছুদিন পর মিউজিয়ামে গিয়ে দেখা মিলবে এ সবের।অথচ মাত্র দশ-বিশ বছর আগের কথা! যাইহোক, সেই উনুনের কাছাকাছি বসে আগুন পোহানোর মজা কম ছিল না। গ্রামেগঞ্জে লোডশেডিং-এর কোনো সমস্যা ছিল না তখন - কারণ বিজলিবাতিই আসে নি সেখানে। কেরোসিনের লম্ফ আর হ্যারিকেনের আলোয় চলতো সান্ধ্য আড্ডা।আর দেয়ালে নিজেদেরই লম্বা লম্বা

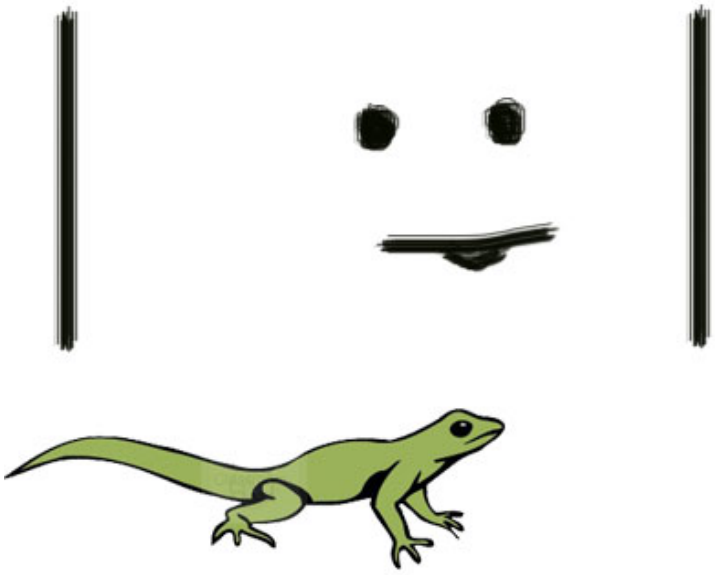
ছায়া দেখে ভয়ে ছোটোরা কেউ অন্ধকারে উঠে একা বাইরে যেতে চাইতাম না।

নলেন গুড়ের সন্দেশ নিশ্চয় খেয়েছ তোমরা? কিন্তু খেজুর গাছের রস জমানোর জন্য যে হাঁড়ি বাঁধা হয়, তা থেকে রস চুরি করে খাওয়ার মজা তো পাও নি! এক বিচ্ছু খুড়তুতো ভাই-এর সঙ্গে সন্ধে নাগাদ গিয়ে সেই অ্যাডভেঞ্চারও করেছি একবার। ধরা পড়লে অবশ্য মজাটা আর কেউ পেত! তবে সারা রাত রস জমার পর সকালে যখন জ্বাল দিয়ে গুড় বানানোর জন্য হাঁড়ি নামানো হয়, গেলাস ভর্তি সেই টাটকা রসে পাটকাঠির স্ট্র ডুবিয়ে খাওযার আনন্দ কোল্ড ড্রিংকে পাবে না।

ছোটবেলার আর একটা মজার স্মৃতি মনে আছে এই শীতকালের।গ্রামের বাড়িতে চড়ুইভাতি। বাড়ির সকলে মিলে হৈ হৈ করে আমাদের আমবাগানে যাওয়া হয়েছিল বনভোজন করতে। মাটি কেটে উনুন তৈরি হল।ঘর থেকে সবাই চাল, ডাল, মশলাপাতি,আলু এসব নিয়ে যাওয়া হল। আমবাগানের পাশেই আমাদের বেগুনের ক্ষেত থেকে পটাপট বেগুন তোলা হল - বেগুনি ভাজা খাওয়ার জন্য। সারা দুপুর চলল খুব হৈ হল্লা। ঘরে ফেরার পথে কেমন যেন বেশি করে শীত শীত করতে লাগল। তারপর এল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর - আর সাথে সাথে মোটা মোটা লেপের তলায় চাপা পড়লাম! এর পর বিচ্ছিরি সব ওষুধ আর ইঞ্জেকসনের ছুঁচ - স্মৃতি তেমন আর মধুর নয়!!

জ্যোতির্ময় দালাল
টেক্সাস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ছোট নাটক: সুড়সুড়িও ভীষণ অতি



ছোট্ট নাটক –
'সুড়সুড়িও ভীষণ অতি'
দেয়াল ও টিকটিকি।
চরিত্র, মাত্র দুটি।

দেয়াল:
পিঠে কেন লাগে সুড়সুড়ি?
বলে ফেল তাড়াতাড়ি!

টিকটিকি:
ছুটছি যে তোমার পিঠে চড়ে।
পোকা মাকড়ের নাগাল আমি
পাই নইলে কি করে?
থাকলে তোমার আপত্তি,
থামতে হয় এক্ষুনি।

দেয়াল:
থামবি কেন? ছোট না আরও।
আরাম লাগে, বড়ো ভালো!
নইলে তো সেই দাঁড়িয়ে থাকা।
ছাদটা মাথায় ধরে রাখা।
পিঠের ব্যথা দিচ্ছে চারা,
শরীরটাও – ম্যাজ ম্যাজ।

ছোট্ট পায়ের আলতো চাপে -
আঃ হাঃ আরাম ম্যা-সাজ!
নে, থামিস না আর
ছোট লাগাতার।

[টিকটিকিটি একটু ছোটে
খানিক ছুটে, একটু থামে।
(টিকটিকি কি ছুটলে ঘামে?)
ছুটে লাফিয়ে পোকা ধারে।
আরেকটা পোকা ওই যে দূরে।
আবার ছোটে একটু ঘুরে -
নাগাল পেতে - ধীরে ধীরে।
ছোটে - থামে,
ডাইনে - বামে
নানা কৌশল পোকা শিকারে।
ছোটে না সে এক নাগাড়ে।]

দেয়াল: [স্বগত]
অকারণে থামে কেন?
ফাঁকি দিচ্ছে - মনে হচ্ছে যেন।
[ভাবে দেয়াল - হয় বিরক্ত।]
সুড়সুড়ি দেবে এক নাগাড়ে -
ব্যাপারটা কি ভীষণ শক্ত?
[টিকটিকিকে] থামিস কেন যখন তখন?
ছোট 'নন-স্টপ' - ছোট 'ম্যারাথন'!

টিকটিকি:
থামি কেন? আছে কারণ।
ভয় যে লাগে - যদি ঘটে অঘটন।

দেয়াল:
সুড়সুড়ি আর কাতুকুতু
নিরীহ অতি - মজা শুধু।
তাই দিয়ে ঘটাবি অঘটন?
বাজে বকছিস! ছোট এখন!

টিকটিকি:
ভেবে দেখো দেয়াল-দাদা,
যদি অবিরাম ছুটি তির-তির,

আরামে পিঠটা তোমার
করে উঠবে শির শির।
সামলে ওঠার পাবে না অবকাশ।
দম আটকে করবে হাঁস-ফাঁস!
ধীরে ধীরে নড়বে কেঁপে,
দুলবে তুমি হাসির বেগে।
চিড়! ফাটল! ধরাম ধুপ!
ব্যস তুমি - ইট বালি সুরকির স্তূপ।

দেয়াল:
ওরে হতভাগা! কি বলছিস?
ভীষণ চক্রান্ত জাল - তুই বুনেছিস!
নিষ্ঠুর পেঁচাল চালে -
হাসিয়ে দুলিয়ে দিতে চাস ঠেলে!
শত-চূর্ণ! অসহায়!
লুটিয়ে ভূতলে!
এতদিন বুঝি নি আমিওত
ভয়ানক অতি -
তোর মতিগতি!
তুই যে হিংস্র ডাইনোসরের নাতি!

[দেয়াল-দাদা রেগে ওঠে -
টিকটিকি তাই পালায় ছুটে।
ছুট্টে পালায় তাড়াতাড়ি,
দেয়ালের পিঠে সুড়সুড়ি।]

দেয়াল:
ওরে ওরে! আস্তে আস্তে!
ছুটিস না ভাই। ধীরে সুস্তে।
হাসি সামলানো হচ্ছে দায়!
পালাবি পালা - হিহি হিহি
টিপ টিপ - আলতো পায়।

শিব শঙ্কর বসু
এপেক্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ছড়া-কবিতা

আমি ও আমার ভূত



বাংলা যখন বাগ মানে না
অঙ্ক জ্বালায় চিত্ত
আমার শেলেট জুড়ে তখন
ভূতেই করে নৃত্য
ব্রহ্মদত্যি, স্কন্ধকাটা,
অন্ধহাটা কিম্ভূত,
শেওড়া গাছের শাঁখচুন্নি,
জাম গাছের জাম ভূত,
দেখতে সবাই এক এক রকম
এক এক রকম ভঙ্গী
এরাই আমার বন্ধু

আমার একলা রাতের সঙ্গী
বাবা আমায় কানমলা দেয়
মা বলেছে গাধা
পাই না আশি নিরানব্বই
প্রাইজ গাদা গাদা
আমার দ্বারা যদি কিছু
না হয় তবে ধুত্
দিনে রাতে খড়ি হাতে
আঁকব আমি ভূত
কখনো যদি ভূতের রাজা
নেমে শেলেট থেকে
কি নিতে চাস
খোনাসুরে বলেন আমায় ডেকে
আমি বলব চাই না প্রাইজ
চাই না গাড়ি বাড়ি
তুমি দেখো আমি যেন
মানুষ হতে পারি।

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী
ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

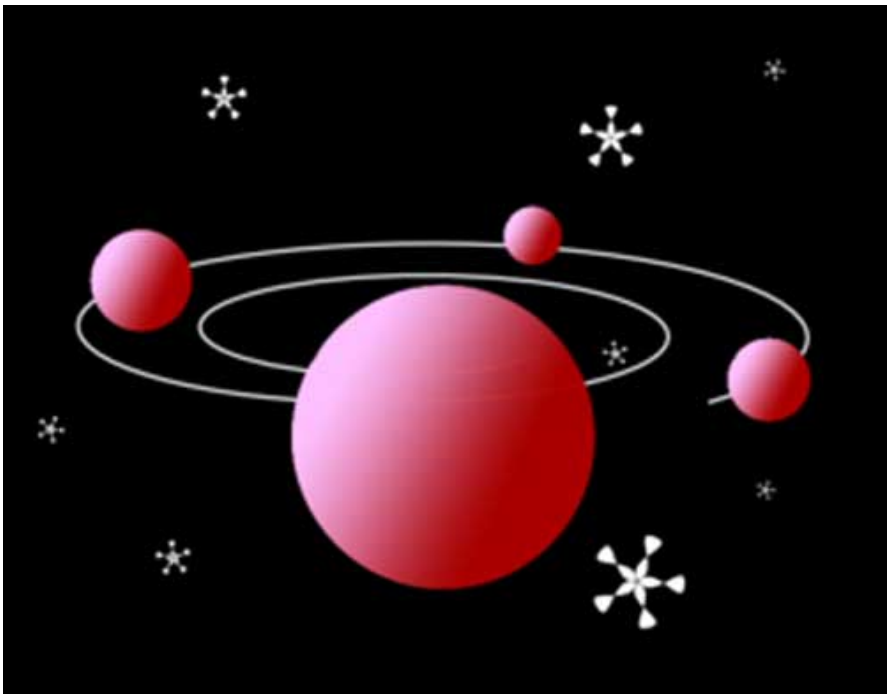
টিয়া



লালটুকটুকে ঠোঁটখানি তোর সবুজবরণ গা
তোকে দিলাম লঙ্কাপাকা এই যে টিয়া খা ;
গবগবাগব পুরিস মুখে তোর লাগেনা ঝাল?
একটুখানি মুখে দিলেই আমার যে কী হাল!
বাঁকা ঠোঁটে তীক্ষ্ণ সুরে কী করে দিস শিস
লক্ষ্মী টিয়া শিস দেওয়াটা শিখিয়ে আমায় দিস,
লোকের কথা শুনে শুনে নকল করিস ভাই
সেই বিদ্যে সবার আগে শিখতে আমি চাই।
কাঁচা ছোলা ভিজিয়ে দেব খোসা ছাড়াই খাবি
কথা দিলাম এখুনি এক পাকা কলাও পাবি।
টি টি করে ডাক ছেড়ে ভাই শিস দিয়ে তুই ডাক
তোরই কাছে বনের টিয়া শিসটি শিখে যাক।

জামাল ভড়
বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

সরল সত্য



জ্ঞানের আলোয় চিনতে শেখো জগতটাকে
আসুক বিষাদ অমানিশা যুক্তি বুদ্ধি পথের দিশা
অদৃষ্টবাদ ঘোরায় শুধু ঘূর্নিপাকে।

নীরোগ রেখ শরীর নিয়ম মেনে কঠোর
অসুখ যদি হঠাত আসে ডাক্তার ওষুধ আছে পাশে
মুশকিল আসান নয়কো তাবিজ রত্ন পাথর

জীবনখেলা সাঙ্গ করে গেল যে জন
আর কোনদিন ফিরবে নাকো, স্মৃতির ঘরেই তাকে রেখ
সূক্ষ্মশরীর, পুনর্জন্ম- গল্পকথন।

দূর আকাশে আলো হাতে চলছে কারা।
জ্যোতিষী নয় গণিত তত্ব মেলে ধরবে আসল সত্য
দূরবীনেতেই ধরা দেবে সূর্যতারা।

ডঃ মাধব চট্টোপাধ্যায়
হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র প্রদেশ

ছবিঃ ইন্টারনেট

ভারত রতন



ব্যাট হাতে সেই ছেলেটা
সবার ভরসা, আশা সবার।
যতক্ষণ সে আছে মাঠে
বলটা পাঠায় এধার ওধার।

দেখতে ছোট। ব্যাটটা হাঁকায়
বোলার বেচারি বেসামাল
ফিল্ডাররাও হাঁপিয়ে ছোটে
ক্যাপ্টেনের তো হাঁড়ির হাল।

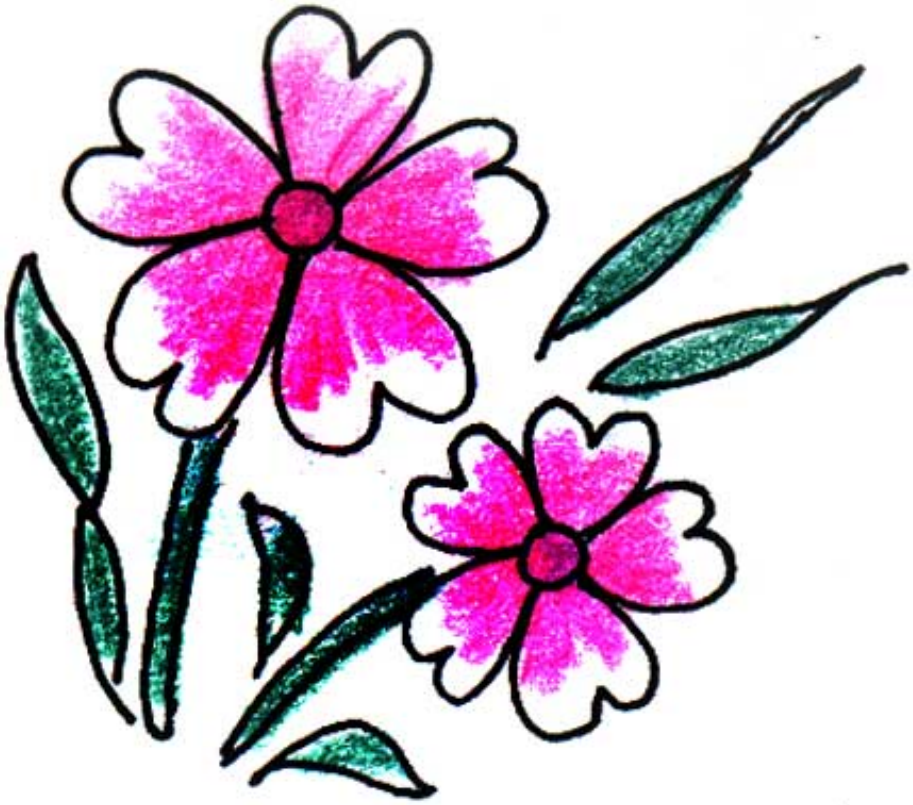
পঞ্চাশটা জল ভাত তার
হাল হামেশা মারছে চার
বলটাও ভয়ে কুঁকড়ে যেন
পালাবার পথ নেইকো আর।

এবার দেখি বলতো ভায়া
ব্যাট হাতে মাঠে আপনজন
বিশ্ব চেনে এক ডাকেতে
কে সেই ভারত রতন?

সমর চট্টোপাধ্যায়
গড়িয়া গার্ডেন্স, কলকাতা

ছবিঃউইকিপিডিয়া

সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি



সেই যে আমার
নানা রঙের দিনগুলি
মায়ের হাতের
তালের বড়া ক্ষীর পুলি.

সেই যে আমার
নানা রঙের দিনগুলি
জারুল ডালে
আপন ভোলা বুলবুলি.

সেই যে আমার
নানা রঙের দিনগুলি
ঈদ মুবারক
দোলের দিনে কোলাকুলি.

সেই যে আমার

নানা রঙের দিনগুলি
গা ছমছম
চিলে কোঠার ঘুলঘুলি.

সেই যে আমার
নানা রঙের দিনগুলি
কালির দোয়াত
স্লেট, পেন্সিল, রং, তুলি.

সেই যে আমার
নানা রঙের দিনগুলি
ভুলতে গিয়েও
কেমন করে তা ভুলি।

তন্ময় দাশ
ভদোদরা, গুজরাট

হেমন্ত আর শীত



হেমন্তের কথা-

কুয়াশার এই মায়ার চাদর
জড়িয়ে তোকে করব আদর
কেউ করে নি এমন তো।
তাই তো আমি হেমন্ত।।

দখিণ-ছোঁয়া আমার আলো
তোকেই ছুঁতে হাত বাড়ালো
ন্ন জুড়লেই নেমন্ত।
আমিই যে সেই হেমন্ত।।

মন হারালি আবার কিসে
সোনায় ভরা ধানের শিষে
খুঁজে দিলাম সে মন তো।
আমিই তোদের হেমন্ত।।

শীতের কথা-

আসছি শুনেই কাঁপছে যে তোর হরফ
এসেই যেন ঝরিয়ে দেব বরফ
আমার সাথে খেলবি নে কিতকিত?
আমি তোদের শীত।।

এদিক-ওদিক-অন্যদিকে
হঠাৎ ছুটির ও পিকনিকে
গাইবি নে কি আমার সাথে গীত?
আমিই তোদের শীত।।

পিঠেপুলি খাওয়াই ডেকে
চেরী বসাই ও ফ্লুটকেকে
আমার সাথে করবি নে কি মিত?
তোদের আমি শীত।।

তন্ময় ধর
নতুন দিল্লী

এলো যে শীত



হেমন্তের শেষে এলো যে শীত
সাদা সাদা মেঘ ছেঁড়া,
উড়ে গেলো দূরে,এখন নীল আকাশ,
মাটি হলুদ রোদে ঘেরা।

যখন ভোরের মৃদু শিশির
নরম ঘাসের গালিচায়,
তখন সূর্য্য ঘোমটা সরিয়ে
শিশুদের ঘুম যে ভাঙায়।

ভোরের কুয়াশা,চোখের ঝাপসা,
যেন দিনের ঢাকা চাদর,
রাতের ঘুমের তন্দ্রা জড়ানো
যেন সোহাগের আদর।

ঠান্ডা এড়াতে সুখামেজ নিতে
রোদ্দুরে দিই পিঠ,
আমি ভলোবাসি গরম নরম
দিবসের এই শীত।

তাপসকিরণ রায়
জবলপুর, মধ্য প্রদেশ

গল্প-স্বল্প

পিন্টু ও একটি চশমা



ঘড়ির দিকে আরেকবার তাকালাম। প্রায় সাড়ে সাতটা। ইতিহাসটা নিয়ে বসেছি বটে, কিন্তু চোখদুটো খুব বেশিক্ষন বইয়ের পাতার দিকে থাকছে না। অন্যান্য দিন ইতিহাস পড়তে বসলে এই সময়ে রানা প্রতাপের চৈতক লাফ দিয়ে পেরিয়ে যায় দুই পাহাড়ের মধ্যের গভীর খাদ বা পৃথ্বীরাজের ঘোড়া টগবগিয়ে পিছনে ফেলে দেয় পিছু নিয়ে আসা সৈন্যের দল নাহলে কখনো কখনো দুই দলে লেগে যায় প্রচন্ড লড়াই। যাদের কথা বইতে পড়ি, তাদের সব্বাইকে যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে গল্পের মত। আজকে শিবাজীর গল্প পড়ছিলাম। কি দারুনভাবে শিবাজী পালিয়ে যাবেন ফুলের টুকরিতে লুকিয়ে। কিন্তু সেই দৃশ্যটা সিনেমার মত চোখের সামনে ভেসে উঠছে না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে পড়ায় মন নেই। আজকে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যে আমি আর টুবলু দুজনেই বেশ কিছুটা চমকে গেছি। এমনিতে কোন ব্যাপারেই আমাদের জুড়ি মেলা ভার। আমরা খেলাধুলোয় চ্যাম্পিয়ন, কোন কিছুতে ভয়ও পাই না, পড়াশুনোয় যে একেবারে ধ্যাদ্ধেড়ে এমনও নয় কিন্তু তা সত্তেও এমন একটা ঘটনাবে যে আমরা এক্কেবারে চুপসে যাব, তা কক্ষনও ভাবিনি। চোখ বারবার চলে যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটার দিকে। আটটা কতক্ষনে বাজবে কে জানে?

এই সবের মূলে আছে বিন্তি, আমার পিসতুতো বোন। আমাদের চেয়ে এক ক্লাস নিচুতে পড়ে। ওকে দেখতে খুদে এইটুকুন হলে কি হবে, ওর চোখেমুখে কথার খই ফোটে। প্রতিবারই পিসিরা যখন ছুটিতে আমাদের বাড়ি আসে, তখন কিছু না কিছু করে আমাকে চমকে দেয়। এবারে আমি আর পিন্টু দুজনেই ঠিক করে রেখেছিলাম, যে বিন্তি যাই করুক না কেন, ওকে আমাদের টেক্কা দিতে দেওয়া চলবে না। সে গুড়ে বালি। আজকে বিকেলে খেলে যথারীতি নোংরা হয়ে ঘামে ভিজে আমরা বাড়ি ফিরছি, এমন সময় দেখি ও একটা অদ্ভূত চশমা পরে আমাদের বাগানে ঘুরছে - তাও আবার একা একা। অদ্ভূত বললাম এই কারনে, যে চশমাটা ওর চোখের তুলনায় বেশ বড় আর ওর তো চোখ খারাপ নয় যে চশমা পড়বে।

আমার বা টুবলুর কারোরই চশমা নেই। তাই একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, "কি রে, তুই অত্তবড় একটা চশমা নাকের ওপর চড়িয়েছিস কেন?"

এমনিতে বিন্তি খুব ছটফটে, হাসিখুশি। কিন্তু আজ সে মুখ গম্ভীর করে বলল, "তোরা বুঝবি না।" বুঝব না? এই কথা শুনলে কার না রাগ হয়। আমি চোখের ঈশারায় একবার টুবলুর সাথে কথা বলে নিলাম। তারপর কোন রকমে রাগ চেপে বললাম - "বুঝব না মানে? তুই আমার ছোটবোন হয়ে বুঝবি আর আমরা বুঝব না?"
-"না, মানে বুঝতে না পারলে আমায় বলতে আসিস না। এ অনেক জটিল ব্যাপার।"
-"তা শুনি কিরকম জটিল ব্যাপার?"
-"এ যে সে চশমা নয়। এটা স্পেকট্রোস্কোপ"

একটু থমকে গেলাম। স্টেথিস্কোপ, টেলিস্কোপ, পেরিস্কোপ শুনেছি। স্পেকট্রোস্কোপটা আবার কি? আমি আর টুবলু আবার চোখাচোখি করলাম। ও ও জানে না। কিন্তু একটু কটমট করে তাকালো, যার মানে হচ্ছে এত সহজে ব্যাপারটা মেনে নিলে চলবে না।
একটু ঢোক গিলে বললাম, "স্পেকট্রোস্কোপ আবার কি?"
-"সারাদিন মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াবি তো আর জানবি কি করে। এটা একটা যন্ত্র। এটা দিয়ে ভূত দেখা যায়"
টুবলু এতক্ষন চুপ করে ছিল। এবার একটু গাঁইগুই করে বললে, "ভূত বলে কিছু নেই।"
-"আচ্ছা, তাই নাকি? কে বলেছে যে ভূত নেই?"
টুবলু বলল, "বেশ তো, আছেই যদি তবে দে দেখি তোর চশমাটা, আমরাও দেখি।"
-"প্রথম কথা এটা চশমা নয় একটা যন্ত্র। আর দ্বিতীয়তঃ তোদের চিল্লামিল্লিতে ভূত পালিয়ে গেছে।"
-"বাহ, তাহলে প্রমান হবে কি করে?"
-"প্রমান হবে। আজ রাত আটটায়।"
ঠিক কি করে প্রমান হবে জানতে চাইছিলাম, তার আগেই বিন্তি আর কিছু না বলে একছুটে বাড়ির মধ্যে পালাল।

টুবলু খানিক দাঁড়িয়ে, মাথা চুলকে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা দেওয়ার আগে আমার দিকে ভ্যাবলার মত চাইল। এমনিতে আমাদের দুজনের মধ্যে ও-ই একটু বেশি ওয়াকিবহাল সব বিষয়ে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি যে এবারে বেড়াতে এসেও বিন্তি বেশ একচোট নিয়ে গেল দেখে ও মনে মনে একটু দমে গেছে। আর কিছু না বলেই টুবলুও নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল। ভাবখানা এই যে - "আমি তো আর রাত আটটার সময় এইখানে থাকতে পারব না। তুই কিন্তু চোখ কান খোলা রাখিস।" কিন্তু আমি তো আর সর্বজ্ঞ নই। এমনিতেই টুবলু পাশে না থাকলে আমার সাহস কমে আসে। এখানে অবশ্য সাহসের প্রশ্ন না। চোখা কান খোলা রাখতে হবে আর কি।

বাড়ি ঢুকে যথারীতি মার কাছে রোজকার বরাদ্দ একটু বকুনি খেয়ে হাত পা ধুয়ে পড়তে বসেছি। পিসিরা এসেছে বলে যে আমার পড়ার ছুটি তা নয়। মা'র কড়া শাসন - অন্ততঃ দুঘন্টা পড়তেই হবে, নইলে কপালে দুঃখ আছে। আগে যে কয়েকবার সে দুঃখ আমায় পেতে হয়েছে তা ভুলিনি। পিঠটা বেশ চড়চড় করে উঠেছিল। এখন পিসিরা এসেছে। এর মধ্যে বিন্তি যদি শোনে আমি মার খেয়েছি না পড়ার জন্য তাহলে যেটুকু প্রেস্টিজ আছে তার আর ছিঁটেফোটাও বাকী থাকবে না। কাজেই রোজকার মত

টেবিল চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছি আর ভাবছি কি করে সময়টা কাটানো যায়। পড়ার জন্য বরাদ্দ এই দুঘন্টা শেষ হবে সাড়ে সেই আটটায়। মা গরম দুধের গ্লাসটা দিয়ে গেছে টেবিলে। সেটা ঠান্ডা হলেও শেষ হয়নি। আরো কিছুক্ষন পঁয়ষট্টি পাতায় আটকে রইলাম। ইচ্ছে করেই ইতিহাসটা নিয়ে বসেছি। কারন কেউ জিজ্ঞেস করলে তালে গোলে একটা কিছু বলে দেওয়া যায়। নিদেন পক্ষে আগের চ্যাপ্টারটাই বলে দেওয়া যাবে। অঙ্ক নিয়ে বসলে যদি খাতা সাদাই থেকে যায়, তাহলে মুশকিল।

এদিকে মুশকিল হচ্ছে আমার টেবিলে কোন ঘড়ি নেই। সেটা আছে পিছন দিকে, মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছি কটা বাজল। শেষ পনেরো মিনিট যেন কাটতেই চাইছে না। মনে মনে ভাবছি কি করেই বা প্রমান হবে। বিন্তি আটটার সময় ঠিক কি করবে? আর যদি প্রমান করেই দেয় - তার মানে কি এই যে আমাদের বাড়ির চারপাশে জলজ্যান্ত সব ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে? আমরা তো আবার খালি চোখে ওদের দেখতে পাই না। তার মানে কি এরকম হতে পারে এই ঘুরে বেড়াচ্ছি আর একটা ভূতের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, তাহলে কি আমরা বুঝতে পারব? না কি পারব না? এতদিন কেটে গেছে কিন্তু আমরা ভূতেদের সম্পর্কে কত কম জানি। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে একবার জানলার বাইরের দিকে চোখ গেল। মনে হল অন্ধকারে কি যেন একটা নড়ে গেল। শিউরে উঠলাম। গল্পে যে বলে ভূত নাকি অন্ধকারেই থাকতে ভালোবাসে। ঐ ভূতুড়ে চশমার টানে ওরা এসে এই বাগানের গাছ গুলোতে জটলা পাকিয়েছে কিনা কে জানে? আবার একটা লেবু গাছও আছে। কথাটা ভাবতেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেমন যেন শিউরে উঠল একটু। ভূত আছে কি নেই সেই প্রমানটা না নিলেই নয়? উফফ! এই সময় যদি টুবলুটা পাশে থাকতো।

এমন সময় বারান্দার ঘড়িটায় ঢং ঢং করে আটটা বাজল।

শিবাজীর রাজ্যবিস্তার আর পড়া হল না। আরো খানিকক্ষন এদিক ওদিক করে বই ফেলে উঠে পড়লাম। বাইরের ঘরে আড্ডা বসেছে। বড়রা সবাই, বিন্তিও আছে সেখানে। আমিও পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। সবাই না না রকম কথা বলছে। কিন্তু সেদিকে আমার কান যাচ্ছে না। পিসেমশাই বলছিলেন যে বিন্তি কিরকম ভালো পড়াশোনা করছে, আবৃত্তিতেও প্রাইজ পাচ্ছে। এসব তো আমি জানিই। আমিও প্রত্যেক বছর এক আধটা প্রাইজ পেয়েই যাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় - সেকথা কেউ তুললোই না।

ঘন্টাখানেক চলার পর মা এসে সবাইকে খেতে ডাকতে সব্বাই উঠে পড়ল। আমি আর বিন্তি পাশাপাশিই বসেছিলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে কি রে প্রমানটা কি হল?

বিন্তি বললে, "প্রমানের আর কি আছে, সেটা তো প্রোফেসর শঙ্কুই করে দিয়েছেন। তবে আমি একটা ছোট্ট প্রমান দিচ্ছি তুই আজকে দুঘন্টা ধরে বসে কেবল পঁয়ষট্টি পাতা ওলোট পালোট করেছিস। কিচ্ছু পড়িস নি।" প্রোফেসর শঙ্কুর নামটা কোথাও যেন শুনেছি। পেটে আসছে মুখে আসছে না। আর ও জানলোই বা কি করে যে আমি পড়তে বসেও পড়িনি। সব মিলে কিন্তু কিন্তু করছি এমন সময় বাবা আমাদের কথা শুনতে পেয়ে বললেন, "কিসের প্রমান নিয়ে কথা হচ্ছে শুনি?"
বিন্তিটা এত পাজি দুম করে কথা পালটে ফেলে অন্য একদিন ইস্কুলে কি হয়েছে সেই ঘটনায় চলে গেল। আমি বেগতিক দেখে চুপ করে গেলাম। পড়ায় ফাঁকি মেরেছি এটা যত গোপন থাকে ততই ভালো।

সকাল হতে না হতেই টুবলু এসে হাজির। উত্তেজনার চোটে ও ও নাকি কালকে এক্কেবারে পড়ায় মন

বসাতে পারেনি। অঙ্কস্যার এসেছিলেন পড়াতে। তার কাছে দুটো বোকার মত ভুল করে মারও খেয়েছে। যা বুঝলাম তাতে ঘুমও বড় একটা হয়নি।
"প্রোফেসর শঙ্কু? তুই ঠিক শুনেছিস?"
"এক্কেবারে। কে বলতো তিনি?"
"আমার মনে হচ্ছে আমি একটা বইয়ে পড়েছি"
"কি পড়েছিস?"
"উনি মনে হয় একজন বৈজ্ঞানিক।"
"আমারও তাই মনে হয়। কোথাও যেন নামটা শুনেছি"
"কিন্তু তাই বলে ও জানলো কি করে যে তুই পড়তে না বসে ফাঁকি মেরেছিস"
"আরে সেটা আমি কি করে বলব, ওকে জিজ্ঞেস করলে হত না?"

আমাদের আলোচনা হচ্ছিল বাগানের এক কোনে। খানিক বাদে বিন্তিকেও সেদিকে আসতে দেখা গেল। আমি একটু গলাটা পরিষ্কার করে বললাম, "আচ্ছা, কালকে তুই কি করে জানলি যে আমি পড়ায় ফাঁকি দিচ্ছিলাম?"

বিন্তি অম্লান বদনে বলল, "আমাকে ভূতটা এসে খবর দিয়ে গেল যে"
টুবলু বলল, "কি খবর দিল?"
"এই যে তুই অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের কাছে মার খেলি বা পিন্টু পড়তে বসেছে বটে কিন্তু আদপে পড়ছে না"
"বটে, তা ভূতে আজকাল এইসব খবর দিয়ে বেড়াচ্ছে বুঝি? তাদের আর কোন কাজ নেই?"
"কাজ থাকবে না কেন? তবে ভালো করে ডেকে বললে তারা এইসব করে দিয়ে যায়"
"বেশ তো তা আমাদের একবার চশমাটা দেখা না বাপু। তাহলেই তো সব গোল মিটে যায়"
"উঁহু, সে হওয়ার নয়। চশমাটা আমাকে গিয়েই প্রোফেসর শঙ্কুর কাছে ফেরত দিতে হবে। উনি আমাকে বিশ্বাস করে জিনিসটা দিয়েছেন বটে। তার মানে এই নয় যে আমি সব্বাইকে দেখিয়ে বেড়াব। যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি ওনাকে কি বলব?"
আমরা দুজনেই ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "প্রোফেসর শঙ্কুকে তুই চিনিস নাকি?"
"কেন চিনব না? সারা পৃথিবীর লোক ওনাকে চেনে। উনি এত বড় বৈজ্ঞানিক। আবিষ্কারক। কত দেশ বিদেশের লোক তো ভারতে আসেই কেবল ওনার সাথে দেখা করার জন্য"
আমি বললাম, "তা তোর সঙ্গে কোথায় দেখা হল?"
"কোথায় আবার, গিরিডিতে। উনি তো ওখানেই থাকেন। লোকজনের সঙ্গে বেশী মিশতে চান না। নিরিবিলি পছন্দ করেন। সেবার আমরা যখন গেলাম সেদিন উশ্রী নদীর ধারে মর্নিং ওয়াক করার সময় দেখা হয়ে গেল। আলাপ হওয়ার পর উনি এই যন্ত্রটা আমাকে কদিনে জন্য দিলেন।"
এরপর কিছু কথা বলা চলেনা। বিন্তির সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়ে গেল। আমরা দেখলাম আমরাও ওর কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারছি। এইসব বলে বন্ধু মহলে তাক লাগিয়ে দেওয়ার অনেক সুযোগ আছে। তাছাড়া বিন্তি বলে গেল ওর কাছে নাকি প্রোফেসর শঙ্কু একটা ফর্মুলা দিয়েছেন - সেটা দিয়ে অদৃশ্য হওয়ার ওষুধ তৈরী করা যায়। কয়েকটা কেমিকাল লাগে, তবে ও আমাদের বলে যাবে। তারপর সেটা তৈরী করে নিতে হবে। কয়েকটা দিন হইহই করে কাটল। আর সত্যিই বিন্তি কাগজে করে আমাদের ফর্মুলাটা লিখে দিয়ে গেল।

আমরা দুজনে খেলার মাঠে পিঠে পিঠ টেকিয়ে বসেছিলাম। আজকে মাঠে এসেও খেলিনি।

একটু আগেই বাবাইদাদার কাছে গিয়েছিলাম ফর্মুলাটা নিয়ে। বাবাইদা ডাক্তারি পড়ছে কলকাতায় গিয়ে। আমরা ভাবছিলাম যদি দু একটা করে কেমিকালগুলো এনে দিতে পারে, কিংবা অন্ততঃ যদি উপায়টা বাতলে দিতে পারে। বাবাইদা কাগজটা দেখে আমাদের মুখের দিকে খানিকক্ষন তাকিয়ে তারপর হো হো করে হেসে উঠল। সে হাসি আর থামতেই চায় না। তারপর বললে, "বাবুইয়ের ডিমের সঙ্গে এক্সট্র্যাক্ট অফ গরগনাস? হো হো হো!"

আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি দেখে বাবাইদা খুলে বললো, "ওরে গাধা, প্রোফেসর শঙ্কুর বই থেকে টুকে এনেছিস এইসব? উনি কি আর সত্যি বিজ্ঞানী? উনি তো গপ্পের বিজ্ঞানী রে।"

আমি বললাম, "আমার পিসতুতো বোন যে ওনার সঙ্গে দেখা করে এই ফর্মুলা পেয়েছে বলল?"
"ওরে গাধা কি আর সাধে বলি? তোদের স্রেফ বোকা বানিয়েছে একটা পুঁচকে মেয়ে।"

সেই থেকে আমরা দুজনেই বেশ মুষড়ে পড়েছি। টুবলু অনেকক্ষন চুপ করে বসেছিল। এবার হঠাৎ তুড়ি মেরে লাফিয়ে উঠে বললে, "এইবারে বুঝেছি!"
আমি চমকে বললাম, "কি বুঝেছিস রে?"
"আরে সেদিন চমকে গিয়ে আমরা এক রকম ধরেই নিয়েছিলাম যে বিন্তি ভূতের কাছ থেকে জানতে পেরেছে আমরা সেদিন কি করছিলাম। এখন বুঝতে পেরেছি আসলে কি হয়েছে। মনে আছে তুই আমাকে বলেছিলি যে সেদিন কি যেন একটা জানলার সামনে দিয়ে চলে গেল?"
"হ্যাঁ, কিছু একটা হবে, কেন?"
"আরে ওটা বিন্তিই ছিল, নইলে আর জানলো কি করে যে তুই কত পাতায় কি পড়ছিলিস?"
এতক্ষনে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল। তার মানে আগাগোড়াই আমাদের বোকা বানিয়েছে। কিন্তু তাহলে টুবলুর ব্যাপারটা ও জানল কি করে? টুবলুকে জিজ্ঞেস করতে বলল, "আরে ওটা স্রেফ আন্দাজে ঢিল। সেদিন বিকেলেই বলতে বলতে আসছিলাম না আজকে আবার অঙ্ক স্যার আসবেন? আর ও নিশ্চয় সেটা শুনে নিয়েছিল। এমন একটা গল্প আমাদের শোনালো যে জানতোই পড়ায় আমাদের মন বসবে না। তাহলে এটা আন্দাজ করা আর কি এমন মুশকিল যে স্যারের হাতে ধোলাই খেয়েছি। আর তারপর এক ফাঁকে এসে জানালা দিয়ে দেখে গেল তুই কি পড়ছিস।"
আমিও ব্যাপারটা বুঝে ঘাড় নাড়লাম।

চশমাটাও তিনতলার ঘরে পাওয়া গেছে। সেটা নেহাতই একটা পুরনো চশমা। ভূত টুত দূরে থাক, এমনিই কিছু দেখা যায় না। যাইহোক, প্রথমে ভেবেছিলাম একটা কড়া চিঠি লিখে এক হাত নেবো। কিন্তু শেষমেষ টুবলুই বুদ্ধিটা দিল। বলল, "আমরা যে এক্কেবারে বেকুব বনেছি সেটা আবার লিখে বসিস না যেন। বরং এইরকম লেখ যে তোর কাছ থেকে ফর্মুলাটা পেয়ে দারুন লাভ হয়েছে, আমরা অদৃশ্য হয়ে এখানে দারুন মজা করে বেড়াচ্ছি।" সেই মতই চিঠিটা লিখতে শুরু করেছি। যে কোন দিন পোস্ট করে দিলেই হল।

অভ্র পাল
কলকাতা

জীয়ন ঝর্ণার জল



খুব শক্ত অসুখ হয়েছিলো তুতুলের। সবে তিন দিন হলো হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছে। এই ক'দিন এক ছায়া ছায়া ঘুমের দেশে বেড়িয়ে এলো সে। হাতে-পিঠে ছুঁচ, রক্তের বোতল, মুখোশ পরা কারা যেন সব – সমস্ত কিছু ভারী চোখের পাতায় ধোঁয়ার মতো মনে হতো। মা'র জন্য বুক ঠেলে একটা কান্না বেরিয়ে আসতে চাইতো।

অসুখের নামটাও জেনে ফেলেছে সে – লিউকেমিয়া। তুতুল ঘুমিয়েছে ভেবে বাবা আর ডাক্তারবাবু ফিসফিস করে কথাবার্তা বলছিলেন। রেমিশন হয়েছে, পঁচিশ পার্সেন্ট চান্স এইসব শক্ত শক্ত কথা। হুঁ, না হয় তুতুলের মোটে পাঁচ বছর বয়েস হয়েছে, তা বলে কি তাকে ইংরেজী বলে ঠকানো যায়! তুতুল ঠিক বুঝেছে, সে মরে যাবে। তবে এখন নয়, অনেক দিন পর। থুত্থুড়ে বুড়োই হয়তো হয়ে যাবে তদ্দিনে। যাকগে, যা হবেই সে নিয়ে আর ভেবে লাভ কী! তুতুল তাই খাটে বসে জানালা দিয়ে শালিক পাখির ঝগড়া দেখতে থাকে।

“ওকে সব সময় খুশিতে রাখবেন”, বলছিলেন ডাক্তার কাকু। মজা লাগে তুতুলের। এই ঘরে বসে দুপুর বেলা এদিক-ওদিক তাকালে মন তো আপ্‌সেই খুশিতে ভরে ওঠে! কিছু দূরে প্রবীরদের সাদা ধুমসো বেড়ালটা চোখ বুঁজে তপস্বীর মতো বসে আছে, একটা কাক তার ল্যাজ ধরে দিলো অ্যায়সা টান। একটা বাচ্চা মোষ চার পা তুলে ধুলো উড়িয়ে ছুটে পালাচ্ছে – কই, কেউ তো তাড়া দেয়নি! ঘরের দেয়ালের টিকটিকিটা পুঁচকে পোকাটাকে ধরতে লাফ মেরেই মেঝেতে ধপাস্। মরে গেলো নাতো? একটা কাগজের গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে মারে তুতুল, টিকটিকি অমনি খাটের তলায় সড়াৎ।

অনেক নতুন ছবির বই এসেছে তুতুলের জন্য। ভারী মজার মজার সব ছবি। গল্পও নিশ্চয়ই মজার। কিন্তু কালো কালো অক্ষরগুলো চোখের সামনে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে যায়। আসল ব্যাপারটা শুরু হবার আগেই চোখ ঘুমে ভেঙে আসে। এবার নকশা কাটা জার্মান সিলভারের গ্লাসটার গায়ে চোখ রাখে

তুতুল। একটা দারুণ সুন্দর ট্রেন দাঁড়িয়ে। প্ল্যাটফর্মে কেউ নেই, খালি ফুলের বাগান। ট্রেনের জানালায় আলখাল্লা পরা ওটা কি সেই গল্পের চিনা বুড়োটা, নাকি তার বন্ধু সৌরভ? ঠিক আছে, আজকের মতো অনেক হলো – কাল বাকিটা দেখা যাবে।

মা ঘরে ঢোকেন। চোখ ফোলা ফোলা, মুখে কান্নার গন্ধ। "মা গো, তুমি কাঁদছো কেন? সোনালীর অসুখ করেছে বুঝি?" অবাক তুতুল প্রশ্ন করে। সোনালী ওর ছোট বোন, মাসীমণির মেয়ে।
ঠোঁট কামড়ান মা। "কই সোনা, কাঁদিনি তো, কিচ্ছু হয়নি তো!" তিনি তুতুলকে বুকের কাছে টেনে আনেন। লজ্জা পায় তুতুল। আবদারের সুরে বলে, "একটা গল্প বলো না, মা।"
"গল্প? বেশ – কিন্তু ঘুমোবে তাহলে?"
"সত্যি বলছি মা, তোমার পাশে শুয়ে ঘুমোব।" তুতুল আলগোছে মা'র আঁচল চেপে ধরে।

"এক দেশে এক রাজা ছিলো। সে ছিলো ভীষণ দুষ্টু –"
"মা, রাজারা খালি দুষ্টুই হয়, তাই না? আমার বন্ধু রাজা কিন্তু একটুও দুষ্টুমি করে না।" বাধা দিয়ে বলে তুতুল।
"তাই বুঝি? তা, এই রাজাটার দুষ্টুমিতে কিন্তু দেশের লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। কেউ হয়তো ইয়া বড়ো এক কুমড়ো ফলিয়েছে, রাজা অমনি এসে হাজির। 'দিস্ তো পাঠিয়ে – রানি কুমড়োর ছক্কা বানিয়ে দেবে, খাবো', বলে হুকুম ঝেড়ে চলে যেতো। কুমোর মাটির গামলা বানিয়েছে, 'আরে, আমার গরুকে খাওয়াতে লাগবে', বলে ট্যাঁকে করে হাওয়া। কারো গাছে হয়তো কলা ধরেছে, 'ইস, হাতি বেচারা আমার না খেয়ে মরছে', বলে নিমেষে ঝাড়কে ঝাড় সাফ!
"তবু মানুষ কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাচ্ছিলো। কিন্তু সেবার হলো ভীষণ জলের কষ্ট। প্রচণ্ড গরমে নদী-নালা শুকিয়ে গেলো। তেষ্টায় মানুষের বুকের ছাতি ফাটতে লাগলো। সবাই তখন দল বেঁধে রাজার কাছে গেলো।
"মহারাজ, তেষ্টায় যে মরে গেলাম!" কেঁদেকেটে বলে তারা।
"রাজা এর মধ্যেই পুকুর, কুয়োর যা জল ছিলো তুলে এনে জমিয়েছে প্রাসাদের সব বিরাট বিরাট স্ফটিকের চৌবাচ্চায়। তাই সে চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'যা যা, জল নেই তো আমি কী করবো?'
"মহারাজ, কয়েকটি গভীর দীঘি কাটান – তবে জলকষ্ট ঘুচবে", বলে এক বুড়ো প্রজা।
"ফুঃ, দীঘি কাটাবে! আমার সোনার পিকদানিটা ভেঙে গেছে, তাই সারাবার পয়সাই জুটছে না, আর ওনাদের যতসব উটকো আবদার!" রেগেমেগে বলে রাজা।
"সুজন নামে এক চাষীর ছেলে ছিলো। সে তখন এগিয়ে এসে বললো, 'বেশ মহারাজ, তাহলে আমরা নিজেরাই শাবল, কুড়ুল, কোদাল যা পাই তাই দিয়ে দীঘি খুঁড়বো।'
"মুখের ওপর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনে রাজার মেজাজ গেলো গরম হয়ে। 'যা, তাহলে মর গে!' বলে সে গটমটিয়ে উঠে চলে গেলো।
"লোকজন সবাই কিন্তু সত্যি সত্যিই হৈ-হৈ করে কাজে নেমে পড়লো। কয়েক দিনের মধ্যেই তারা খুঁড়ে ফেললো এক বিরাট দীঘি, তাতে ভরা টলটলে নীল জল।
"সবার মুখে খুশির হাসি। কিন্তু দেখতে না দেখতে তা মিলিয়ে গেলো – যখন লোকলস্কর নিয়ে রাজা এসে সেখানে হাজির হলো।

"অ্যাই ভাগ, ভাগ! আমি রাজা, এই জল আমার।" বলে সব্বাইকে হঠিয়ে দিলো সে। হাতি নামিয়ে দিলো জলে। তীরে বসালো পাহারা। মুখ চুণ করে ফিরে গেলো প্রজারা।

"কাণ্ড দেখে মাটির ভীষণ রাগ হলো। রাজার দুষ্টুমির সাজা দেবার জন্য সে রাতারাতি দীঘির সব জল লুকিয়ে ফেললো। পরদিন সকালে রাজা এসে দেখে – ও মা, সব যে আবার শুকিয়ে খটখট! অনেক তর্জন-গর্জন করলো সে, কিন্তু করেই বা কী ফল!
"দেশের লোক ওদিকে তেষ্টায় শুকিয়ে কাঠ। কত ছোট্ট সোনা ঠোঁট চাটতে লাগলো, কত দাদু-ঠাকুমা মরেই গেলো – তবু না হলো একছিটে বৃষ্টি, না পেলো কেউ একফোঁটা জল।"

তুতুলের চোখ ছলছল। তাই দেখে মা গল্পের গতি বাড়িয়ে দেন,
"এমন সময় একদিন এক বুড়ো এলো সেই দেশে। লাঠিতে ভর দিয়ে চলছে, শনের নুড়ির মতো চুল ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে।
"আমায় কিছু খেতে দেবে গো?" এক চাষীর দোরে এসে হাঁক পাড়ে সে।
"খেতে হয়তো কষ্টেছিষ্টে দিতে পারি, কিন্তু জল মিলবে না।" কান্না-কান্না মুখ করে বলে চাষী।
"ও, তাই বুঝি!" গম্ভীর চালে মাথা নাড়ে বুড়ো। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে তার গায়ে একটু জোর ফিরে এলো। তখন সে ধীরে ধীরে বললো, "শুনেছি, জীয়ন ঝর্ণার জল আছে রামধনুর দেশে। আকাশের ঐ পারে যেখানে রামধনুটা মাটিতে গিয়ে মেশে, সেখানে ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ছে এক মিষ্টি জলের ঝর্ণা। সেই জল এক বোতল যদি কেউ নিয়ে আসতে পারে, তবে তা ছিটিয়ে দিলে মরা মানুষ সব আবার বেঁচে উঠবে, শুকনো খাল-বিলও ভরে উঠবে জলে।
"তবে এ কাজে ঝামেলাও যে নেই, বলবো না। এক বিরাট দৈত্য আছে নাকি সে দেশে। সারা দিনরাত সে ঝর্ণা পাহারা দেয়। তার ভয়ে কেউ ওমুখো হয় না।"

"মা, রাজকন্যার গল্প নয় কিন্তু! ওসব সোনালীর মতো বাচ্চারা শোনে।" তুতুল বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে বলে।
মায়ের মুখ এক সুন্দর হাসিতে ভরে যায়। "ও, তাই নাকি – বুঝতেই পারিনি আমাদের তুতুলবাবু কত বড় হয়ে গেছে!" বলে তিনি আবার শুরু করেন,
"তাই শুনে এগিয়ে আসে চাষীর ছেলে সুজন। টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'দাদু, কেউ না যায় আমি যাবো সেই জল আনতে। তুমি শুধু বলে দাও সেখানে যেতে হলে কী কী করতে হবে।'
"বুড়োর মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সুজনের পিঠ চাপড়ে বলে, 'তোমার মতো সাহসী ছেলেই পারবে সে জল আনতে। তবে কয়েকটা কথা মনে রাখবে।
'প্রথম কথা – দৈত্যকে মারতে তলোয়ার চাই। আজই কামারভাইকে দিয়ে বানিয়ে নাও এক ধারালো তলোয়ার।
'দ্বিতীয় কথা – যখন পথ চলবে, চোখকান খোলা রাখবে। অসহায় জীবের প্রতি দয়াধর্ম করবে।
'আর শেষ কথা – এই জীয়ন ঝর্ণার জল অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে, মরা মানুষকে প্রাণ দেয়। কিন্তু হুঁশিয়ার – কোনো মানুষ যদি দুষ্টু হয়, লোক ঠকিয়ে খায়, তবে এই জল তার গায়ে ছিটিয়ে দিলে সে উলটে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

"মা, আমি আর চিনি চুরি করে খাবো না।" তুতুল মা'কে আঁকড়ে ধরে।
"ওমা, তুতুল তো আমার লক্ষ্মী সোনা – সে আবার দুষ্টু হলো কবে!" তুতুলকে একটা চুমো দিয়ে মা আবার গল্প শুরু করলেন,
"তারপর বুড়ো তো লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে চলে গেলো। আর কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে সুজন তৈরি হলো রামধনুর দেশে যাবার জন্যে।

"রাজার চর কিন্তু খবরটা রাজার কানে তুলে দিলো। আর যায় কোথায় – সেপাই এসে সুজনকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেলো রাজার কাছে।
"কিরে, আমায় না জানিয়ে পালাচ্ছিস যে বড়ো?" রাজা তর্জন করে। কী আর বলবে, সুজন চুপ করেই থাকে।
"যাক, এবারের মতো ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আসার সময় আমার জন্য সেখান থেকে সোনার ফুল, হীরের পাখি আর মণি-মানিকের গাছ নিয়ে আসবি। নইলে তোর ঘাড়ে মাথা থাকবে না।"
"রাজার কথা শুনে সুজন কাঁচুমাচু মুখে ঘাড় নাড়ে। তারপর গুটিগুটি পায়ে ফিরে আসে।

"কিন্তু রামধনুর দেশের রাস্তা খুঁজে পাওয়া কি সোজা কথা! এক বছরের ওপর বৃষ্টি হয় না, লোকে শেষ কবে রামধনু দেখেছে তাও ভুলে গেছে। তবু ভেবেচিন্তে একটা দিক ঠিক করে এগোয় সুজন। চলতে চলতে নাহয় একে-ওকে জিজ্ঞেস করে পথ চিনে নেওয়া যাবে।
"চলেছে তো চলেছে, হঠাৎ এক জায়গায় দেখে মহা শোরগোল। 'আমাকে বাঁচাও' বলে একটা বাঁদর ছুটে এসে সুজনের পায়ে পড়ে। পেছনে লাঠি নিয়ে ধেয়ে আসছে একদল লোক।
"আমাদের ফলের বাগান আস্ত রাখে না, আজ মেরেই ফেলবো ওকে", বলে তারা।
"কী করবো, খিদে পায় যে!" কিচ কিচ করে বলে বাঁদর।
"আচ্ছা, ও আর বাগান নষ্ট করবে না। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি", বলে সুজন। বেশ তো – রাজি হয় সবাই।
"প্রাণ বাঁচিয়ে তুমি আমার প্রাণের বন্ধু হলে। কোথায় চলেছো, ভাই?" জিজ্ঞেস করে বাঁদর।
"চলেছি রামধনুর দেশে, জীয়ন ঝর্ণার জল আনতে। চেনো নাকি রাস্তা?"
"ও বাবা, সেখানে তো বিরাট দৈত্য থাকে। তা, কিছুদূর অবধি চিনি। আর বন্ধু যখন বলেছি তখন চিনিয়ে নিয়েও যাবো", বলে বাঁদর।

আবার চলেছে, চলেছে, এবার বাঁদরও আর রাস্তা চিনতে পারছে না। এমন সময় শোনে ঝোপের পাশে মিঁউ মিঁউ কান্না। ভালো করে খুঁজেপেতে দেখে, এক থলের মধ্যে বাঁধা এক সুন্দর সাদা বেড়াল।
"তেষ্টায় দুধ চুরি করে খেয়েছিলাম দেখে আমাকে এভাবে ফেলে রেখে গেছে", কাঁদতে কাঁদতে বলে বেড়াল।
"ইস, বেচারা! এক্কেবারে হাড় জিরজিরে হয়ে গেছে!" থলের বাঁধন খুলতে খুলতে বলে সুজন।
"প্রাণ বাঁচিয়ে আমার প্রাণের বন্ধু হলে। কিন্তু চলেছো কোথায়?" জিজ্ঞেস করে বেড়াল।
"চলেছি রামধনুর দেশে, জীয়ন ঝর্ণার জল আনতে। চেনো নাকি রাস্তা?"
"বাপ রে, দৈত্যের দেশে! তা, বন্ধু বলে যখন ডেকেছি – চলো, যদ্দুর চিনি দেখিয়ে দিই।"

"চলছে তো চলছেই তিন বন্ধু। কত বনবাদার, মাঠঘাট পেরিয়ে গেলো। এবার বেড়ালও আর পথ চেনে না। এমন সময় সামনে পড়লো ছোট্ট মিষ্টি জলের এক খাল। চকচক করে জল খেলো সবাই। খিদে-তেষ্টা দুই-ই যেন তখনকার মতো দূর হলো।
"বাঁচাও, বাঁচাও!" চিঁ-চিঁ করে চ্যাঁচায় কে? দেখাই তো যায় না! ও মা, স্রোতে ভেসে যাচ্ছে এক মৌমাছি। দৌড়ে গিয়ে একটা গাছের পাতা এনে ধরে সুজন, তাই আঁকড়ে কোনমতে উঠে আসে মৌমাছি।
"প্রাণ বাঁচিয়ে প্রাণের বন্ধু হলে। কিন্তু কে গো তুমি? চলেছো কোথায়?" বলে মৌমাছি।
"তিন বন্ধু চলেছি রামধনুর দেশে, জীয়ন ঝর্ণার জল আনতে। চেনো নাকি রাস্তা?"

"ওমা, চিনবো না! রামধনুর দেশেই তো আমার বাড়ি। দুষ্টুমি করে বাবা-মা'র কথা না শুনে অ্যাদ্দুর উড়ে এসেছিলাম, তারপর দম ফুরিয়ে এই অবস্থা। কিন্তু বুকের পাটা আছে তো তোমাদের! দৈত্যের কাছ থেকে চলেছো জীয়ন ঝর্ণার জল আনতে?"
"আনতে না পারি, প্রাণ তো দিতে পারবো", বলে সুজন। তিন বন্ধু চলতে থাকে, আর তাদের মাথার ওপর উড়ে উড়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে মৌমাছি বন্ধু।

"কত পাহাড় পেরিয়ে, নদী-নালা ডিঙিয়ে এগিয়ে চলে তারা। চলে, চলে, চলে, পথ আর ফুরোয় না। শেষ পর্যন্ত একদিন এক ঘন জঙ্গল ভেঙে বেরিয়ে এসে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়।
"এক ঝলমলে আলোর দেশ তাদের সামনে। আকাশ সুন্দর সাতটা রঙে উজ্জ্বল হয়ে আছে। দূরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আনন্দে খেলা করে বেড়াচ্ছে। আর কী সব অপূর্ব পাতাবাহারী গাছে, রঙবাহারী ফুলে ভরে আছে চারদিক – কোথায় লাগে তার কাছে সোনা, হীরে, মানিকের ছটা! এক মিষ্টি গানের সুরে ভরে উঠছে বাতাস। দূরে দেখা যায় এক বিরাট পাহাড়, সবুজে সবুজে ছেয়ে আছে তার গা। আর সেখান থেকে ঝির ঝির ঝরে পড়ছে এক ঝর্ণা – জীয়ন ঝর্ণা!
"সবাই সেদিকে চেয়ে আছে, কারো মুখে কথা জোগায় না। শেষ অবধি সুজনই বলে, 'তাহলে মৌমাছি বন্ধু, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। বাঁদর আর বেড়াল বন্ধু, তোমরা এখানে একটু বসো। আমি যাচ্ছি ঝর্ণার দিকে। যদি আর না ফিরি, আমার জন্যে দুঃখ করো না। পারো তো গাঁয়ে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিও – সুজন শেষ অবধি জীয়ন ঝর্ণার জল আনতে পারেনি বটে, কিন্তু চেষ্টার কসুর করেনি।
"কী আর করে, চোখের জল ফেলে সবাই সুজনকে বিদায় জানায়। 'বিপদ হলে মনে মনে আমায় ডেকো', বলে বাড়ির দিকে উড়ে যায় মৌমাছি।

"বুকভরা সাহস নিয়ে এগিয়ে চলে সুজন। গাছের পাতারা বলে, আমাদের ধরো। ছোট শিশুরা বলে, আমাদের কোলে নাও। রঙীন আকাশ থেকে কে যেন বলে ওঠে – ওগো, দু'দণ্ড থেমে আমাদের গান শুনে যাও। কিন্তু কোনোদিকে না তাকিয়ে সুজন সটান এগিয়ে চলে জীয়ন ঝর্ণার দিকে।
"ও মা – কোথায় রঙ, কোথায় শিশু, কোথায় গান – সব মুহূর্তে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেলো। তালগাছের মত বড় এক দৈত্য যেন আকাশ ফুঁড়ে এসে হাজির। সুজনকে দেখে তার ভাটার মত চোখ রাগে ঘুরতে থাকে।
"দুধের বাচ্চা, সাধ করে মরণের মুখে পা বাড়িয়েছিস। ভালোয় ভালোয় প্রাণটা নিয়ে এখনো ফিরে যা", বাজের মত হেঁকে বলে দৈত্য।
"হয় জল নেবো, নয় প্রাণ দেবো।" তলোয়ার খুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সুজন। ঝড়ের বেগে এসে দৈত্য ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর।
"বীরের মত লড়ে সুজন – কিন্তু ঐ ধুমসো দৈত্যের সঙ্গে পারবে কেন! কিছুক্ষণের মধ্যেই দৈত্য তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে রেখে হাসতে হাসতে চলে যায়।"
তুতুলের ঠোঁট কাঁপে, গলার শুকনো ডেলাটা আর ভেতরে থাকতে চায় না। কিন্তু অ্যাদ্দিনে কি আর ওর মা'কে চিনতে বাকি আছে! তাই চুপচাপ আবার শুনতে থাকে –

"সারারাত ধরে সেখানে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে দুই বন্ধু বাঁদর আর বেড়াল। তারপর একসময় ভোর হয়। লাল টুকটুকে সুয্যিমামা যাবার পথে এই দৃশ্য দেখে থমকে থেমে যান। তাঁর মন কেঁদে ওঠে। কী করেন, কী করেন – শেষে এক ফুঁয়ে জীয়ন ঝর্ণার খানিকটা জল আকাশে উড়িয়ে দিয়ে মেঘ করলেন। একটু পর ঝমঝম বৃষ্টি হয়ে সেই মেঘ জল ঢাললো সুজনের গায়ে।

"ঊঃ, বড্ড ঘুমিয়েছি!" আড়মোড়া ভেঙে উঠে বলে সুজন। জলের ছোঁয়ায় তার শরীর আগের চেয়ে বড় হয়েছে, শক্তিও হয়েছে আগের চেয়ে বেশি।
"হ্যাঁ, দিব্যি ঘুম মেরেছো, বন্ধু!" মুখ টিপে হাসে বাঁদর-বেড়াল, খুলে আর কিছু বলে না।
"খবর পেয়ে আবার ধেয়ে আসে দৈত্য। দাঁত কড়মড় করতে করতে বলে, "মানুষের বাচ্চা, এবার দেখি তুই কী করে বেঁচে উঠিস।" সে যা ভয়ানক লড়াই হয়! দৈত্যের একটা হাতও কাটা যায়। কিন্তু হলে হবে কী, দৈত্য আবার সুজনকে মেরে ফ্যালে। তারপর সে সুজনের শরীরটা ভালো করে মাটিতে পুঁতে রেখে জীয়ন ঝর্ণার দিকে এগোয়। সেখানে গিয়ে ঝর্ণার খানিকটা জল লাগিয়ে কাটা হাত আবার জুড়ে নেয়।"
"আচ্ছা মা, দৈত্য তো দুষ্টু। তবে জীয়ন ঝর্ণার জল লেগে ছাই হয়ে গেলো না কেন?" – তুতুলকে ফাঁকি দেওয়া কি অত সোজা!
এই রে! অলক্ষ্যে জিভ কাটেন মা। তারপর ভেবেচিন্তে বলেন, "দৈত্য কি মানুষ? দুষ্টু মানুষ তো ছাই হয়ে যাবে, তাই বললো না বুড়ো?"
"বুঝতে পেরেছি, এবার বলো তারপর কী হলো।" তুতুল আবার গুটিসুটি মেরে বসে।

"কী হবে, কী হবে – দুই বন্ধুর তো মাথায় হাত! কাল সকালে এসে সুয্যিমামা যে সুজনকে খুঁজে পাবেন না! কী করে তাকে বাঁচাবেন তবে?
"দাঁড়াও, আমি দেখি চেষ্টা করে।" বলে বেড়াল। তারপর সে নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে মাটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়ছে তো খুঁড়ছেই, মাটি তুলছে তো তুলছেই, শরীর আর চলে না! ভোর প্রায় হয়ে আসে। এমন সময় শেষ অবধি তার নখে ঠেকে সুজনের শরীর। চটপট আঁচড়ে-পাঁচড়ে তার ওপরের মাটিটুকু সরিয়ে দেহটা খোলা জায়গায় টেনে আনে দুই বন্ধু।
"সকালবেলা সুয্যিমামা আবার বাঁচিয়ে দিলেন সুজনকে। আরো বড় হয়ে গেলো সুজন, গায়ে হলো আরো জোর। আবার ধেয়ে এলো দত্যি।
"আরো জোরদার লড়াই হলো এবার। দৈত্যের একটা পা গেলো উড়ে। কিন্তু এবারও শেষ অবধি তারই হলো জয়। সুজনকে মেরে ফেলে সে এবার দেহটা একটা কাপড়ের পুঁটলিতে পাকিয়ে রেখে দিয়ে এলো এক্কেবারে উঁচু সেই পাহাড়ের মাথায়, গাছপালার আড়ালে। "দেখি এবার শেয়ালে-কুকুরে কী করে তোর দেহ খুঁড়ে তোলে!" হা-হা করে হেসে বলে দৈত্য। তারপর ঝর্ণার জলে পা-টা জুড়ে আবার ঠিক আগের মতন।
"রাত্তির হতেই বাঁদর হুপহাপ গাছে গাছে লাফিয়ে চলে। পাহাড়ের মাথা – সে কি এখানে! তবু হাল ছাড়ে না বাঁদর। শেষ অবধি সুয্যিমামা যখন উঠি-উঠি করছেন, সে খুঁজে পেলো সুজনের শরীর। পুঁটলি খুলে দেহটা বের করে ফেলে রাখলো খোলামেলা জায়গায়।

"এবার বেঁচে উঠে আরো বড় হয়েছে সুজন। আবার আসে দৈত্য। সে যা একখান লড়াই হয়, সবার অনেকদিন মনে থাকবে। এবারেও জেতে দৈত্য। তবে সে টলছে, ভালো করে চলতে পারছে না। তার সারা শরীর বেয়ে রক্ত ঝরছে।
"দেখি, এবার কোন পশু-পাখি তোকে বাঁচায়!" বলে সে ঝর্ণার পাশে নিয়ে যায় সুজনের শরীরটা। তারপর তাকে আড়াল করে নিজে সটান শুয়ে পড়ে।
"বাঁদর-বেড়ালের তো মাথায় হাত! ঐ পাহাড়ের মত দেহের আড়ালে কী করে সুয্যিমামার চোখ পৌঁছোবে! তাহলে কি আর সুজন বাঁচবে না? চোখের জলে ভাসে তারা। শেষে কোনো উপায় খুঁজে না

পেয়ে আকূল হয়ে মৌমাছি বন্ধুকে স্মরণ করে।
"এসে গেছি, বন্ধু!" গুনগুন করতে করতে ছুটে আসে মৌমাছি। বেড়াল, বাঁদর সব খুলে বলে তাকে।
"হুঁ, এই ব্যাপার! দাঁড়াও, পাজি দৈত্যের জারিজুরি বন্ধ করছি", বলে উড়ে ফিরে যায় মৌমাছি।
"ভোর হবো হবো করছে। মজাসে ঘুমোচ্ছে দৈত্য। এমন সময় লাখ লাখ মৌমাছির এক ঝাঁক তাকে আক্রমণ করে। কামড়ের পর কামড়, কামড়ের পর কামড় – হুলের জ্বালায় দৈত্য অস্থির হয়ে ওঠে। শেষ অবধি আর থাকতে না পেরে উঠে জঙ্গলের দিকে দৌড় লাগায়।
"সুয্যিমামা তখন উঠে পড়েছেন। তাঁকে দেখে আনন্দে নাচতে থাকে জীয়ন ঝর্ণা। আর তার একটা বড়সড় জলের ঝাপটা এসে আবার সুজনকে জাগিয়ে তোলে। বাড়তে বাড়তে এতদিনে দৈত্যের প্রায় সমান হয়ে উঠেছে সুজন। শক্ত হাতে তলোয়ার ধরে এবার সে শেষ লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়।
"দৈত্য আসে। তারপর চলে সেই লড়াই যা আগে কেউ কখনো দেখেনি, পরেও কখনো দেখবে না। তিনদিন, তিনরাত সমানে যুদ্ধ চলে। দেখেশুনে সুয্যিমামাও যেন পূব আকাশে উঁকি মারতে ভয় পান। তারপর একসময় সুজনের তলোয়ারের কোপে দৈত্যের মাথাটা ছিটকে যায়।
"বনজঙ্গল ভেঙে হুড়মুড় করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দৈত্যের পেল্লায় লাশ। তারপর আর কী? নিশ্চিন্তে ঝর্ণার জল ভরে নেয় সুজন। হঠাৎ দেখে, আলোয় আলো হয়ে উঠেছে চারদিক। আবাক হয়ে সবাই ওপরে তাকায় – দেখে, আকাশ জুড়ে আবার দেখা দিয়েছে এক সাতরঙা রামধনু।

"গাঁয়ে ফিরে চলে সুজন। 'চলো, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।' সাথে সাথে চলে তিন বন্ধু।
"খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসে রাজা। 'দাঁড়াও, একটু মজা করা যাক', বুদ্ধি-পরামর্শ করে তিন বন্ধু। তারপর মৌমাছি সাজে সোনার ফুল, বেড়াল হীরের পাখি আর বাঁদর মণি-মানিকের গাছ।
"কী রে, এনেছিস আমার জিনিস – আরে, ঐ তো!" লোভে রাজার চোখ জ্বলে ওঠে। সব কিছু ভুলে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। আর তখন সুজন তার গায়ে ছিটিয়ে দেয় জীয়ন ঝর্ণার জল। মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দুষ্টু রাজা।

"তারপর আর কী! সারা রাজ্যে নদী-নালা-পুকুর-মাঠে জীয়ন ঝর্ণার জল ছিটিয়ে দেয় সুজন। বেঁচে ওঠে শুকিয়ে মরে যাওয়া যত মানুষ। আর তারপর আকাশ কাঁপিয়ে নামে তুমুল বৃষ্টি। নদী-নালা-খাল-বিল-পুকুর সব জলে থৈ-থৈ করতে থাকে। সবুজ সবুজ গাছপালায় চারদিক ছেয়ে যায়। ধানে মাঠ ভরে ওঠে।"

বড় আনন্দ! এতক্ষণের চেপে রাখা কষ্টটা এবার একটু একটু করে গলে বেরিয়ে আসে। দু'চোখ ঝাপসা হয়ে যায় তুতুলের। ভেজা চোখের পাতায় সে দূর আকাশের রামধনু দেখে।
"মা, বড় হয়ে আমি জীয়ন ঝর্ণার জল আনতে যাবো।" ফিসফিসিয়ে বলে তুতুল।
"যেও, সোনা।" হঠাৎ বালিশে মুখ লুকিয়ে ফ্যালেন মা। তুতুল তাঁর কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে মায়ের চুল থেকে। জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় তুতুল। স্বপ্নে এক টুকরো ছোট্ট হাসি তার মুখে লেগে থাকে।

অনিরুদ্ধ সেন
থানে, মহারাষ্ট্র

ভবিষ্যতের পৃথিবী



বছর ছয়েকের স্যাংপো মা বাবার হাত ধরে লাফাতে লাফাতে চলেছে পার্কে বেড়াতে। আজ রবিবার - মা বাবার ছুটি আর এই দিনটা স্যাংপোর সব থেকে আনন্দের – মা কত কিছু রান্না করে ওর জন্য আর বাবা কত গল্প শোনায় তারপর বিকেলে ওরা তিন জন হাত ধরে বেড়াতে আসে পার্কে। সপ্তাহের বাকি ছয়দিন তো মা বাবার অফিস থাকে বলে একেবারেই সময় পায় না আর স্যাংপোকেও ভোর বেলা উঠে স্কুলের জন্য তৈরি হতে হয় ফলে ওদের দেখা হয় সেই রাত্রে বেলা আর তখন স্যাংপো ঘুমে ঢুলছে – মা খাইয়ে দিতে না দিতেই মার কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। রোজ বিকেলেই স্কুলের দিদিমণি ওদের নিয়ে আসেন এই পার্কে খেলার জন্য তবে স্যাংপোর মনে হয় মা বাবার সাথে এলে পার্কটা যেন আরও বেশী ভালো লাগে। পার্কে এসে ওরা নরম ঘাসের কার্পেটেই বসে পড়লো তবে স্যাংপো ঘাসের মধ্যে বার কয়েক গড়াগড়ি দিয়ে মার কোলে মাথা দিয়ে আর বাবার কোলে পা দুটো তুলে দিয়ে আরাম করে শুলো। 'জানো বাবা, আজ না আমাদের দিদিমণি বলেছিলো চার পাঁচশো বছর আগে মানুষ এই ডোম পৃথিবীতে থাকতো না – ওরা একটা মস্ত বড় পৃথিবীর মাটিতে ঘুরে বেড়াতো – সেটা নাকি লম্বা চওড়াতে হাজার হাজার কিলোমিটার। সেখানে অনেক গাছ পালা, বড় বড় নদী, পাহাড়, জঙ্গল ছিলো। সেই পৃথিবীর ত্রি-মাত্রিক সিনেমাও দেখিয়েছে - কত বিরাট সব বাড়ি – এক একটা মনে হলো আমাদের ডোম থেকেও উঁচু, আর এক একটা পার্ক তো আমাদের এই ডোম থেকেও বড়। খুব সুন্দর ছিলো দেখতে – আমাদের এই ডোমটা কত্তো ছোট আর বাড়ি গুলোও ভীষণ ছোট ছোট। আমরা সেই পৃথিবীতে যেতে পারি না?' কিঞ্জল হাসলেন, 'ওই পৃথিবীটা তো হারিয়ে গিয়েছে স্যাংপো – ডুবে গিয়েছিলো সমুদ্রের জলের তলায় – তাই তো আমরা এই ডোম বানিয়ে সমুদ্রের নিচেই থাকি। দাঁড়া,

তোকে সেই বিরাট প্লাবন আর বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা গুলো বলি। জানিস তো আমাদের এই ডোম শহরের মত আরো অনেক ডোম শহর আছে জলের নিচে – এই শহর গুলোর সব নম্বর দেওয়া আছে। বল তো আমাদের এই ডোম শহরের নম্বর কত?' শহরের নম্বর, নিজেদের নম্বর, এই রকম আরো অনেক দরকারি খবর এদের মুখে বোল ফোঁটার সাথে সাথেই একেবারে ঠোঁটের ডগায় – কারণ জন্মের আগেই যে ছোট্ট কম্পিউটার সবার মাথাতে বসিয়ে দেওয়া হয় তাতে এই রকম অনেক দরকারি খবর দেওয়া থাকে ফলে সেগুলো আপনা থেকেই মনে চলে আসে।

'এই ডোমটা তো ৭২০এ-মেইন আর আমার নম্বর হলো ৭২০এ-এম-৪৮৭৩৬-স্যাংপো - ঠিক কিনা বল?' 'ঠিক। ওই পৃথিবীর লোক তো আমাদের মত এত উন্নত ছিল না তাই ওদের শুধু নামই থাকতো আর প্রত্যেকটা দেশেরও আলাদা নাম ছিলো – যেমন ধর চিন, ভারতবর্ষ, অ্যামেরিকা, এই রকম। প্রত্যেক দেশের আবার ভাষাও ছিলো আলাদা এমন কি একটা দেশেই হয় তো কুড়ি পঁচিশটা ভাষা ফলে এই নিয়ে সব সময় গোলমাল লেগেই থাকতো। একুশ শো শতকের সেই সুজলা সুফলা পৃথিবী তো এখন শুধুই কল্পনা – তোরা তো ছবিতেই দেখেছিস সেই সুন্দর পৃথিবীকে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ পৃথিবীর বুকে খুব অত্যাচার করেছিলো – জঙ্গলের সমস্ত গাছ কেটে পরিষ্কার করে দিয়েছিলো, পরিবেশ সংরক্ষণের কথা কখনই ভাবে নি যার ফলে অবাধে মানুষের তৈরি নানা রকমের বিষাক্ত গ্যাস বায়ু মন্ডলকে দূষিত করে আকাশে ওজোনের যে ঘেরাটোপ এই পৃথিবীকে রক্ষা করতো সূর্যের নানা রকম রশ্মী ও গরম থেকে সেটাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিতে থাকে ফলে গরম বাড়তে শুরু করলো সেই সাথে বৃষ্টিও ভীষণ কমে গেলো ফলে ধীরে ধীরে সেই চির সবুজ পৃথিবী হয়ে গেলো একেবারেই নেড়া – শুধু শুকনো মাটি আর পাথর – বৃষ্টির অভাবে নদীগুলোও গেলো শুকিয়ে। তার উপর গরমে সমস্ত উঁচু উঁচু পাহাড় আর দুই মেরুর বরফ গলে সমুদ্রের জল স্তরকে বাড়াতে লাগলো ফলে সমস্ত সমতল এলাকা ডুবে গেলো সমুদ্রের জলে। তখন সেই সব জায়গার লোকরা কোথায় যাবে? ওরা উঁচু এলাকাতে যাবার চেষ্টা করায় ওখানকার লোকের সাথে যুদ্ধ লেগে গেলো। ফলে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে দেশে দেশে এই যুদ্ধ মহাযুদ্ধের আকার নিলো – এটাকে পৃথিবীর ইতিহাসে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বলে। মহাযুদ্ধের সাথে মহামারি ও সমুদ্রের নোনা জলে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে খেতে না পেয়ে ধীরে ধীরে সেই পৃথিবীর প্রায় নব্বই ভাগ লোকই মরে গেলো। বাকিরা বাঁচার তাগিদে ভুলে গেলো নিজেদের আলাদা আলাদা ভাষা, ধর্ম, আচার ব্যবহার – বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে তৈরি হলো নতুন পৃথিবীর মানুষ – এদের ভাষা হলো আজকের আমাদের এই আন্তর্জাতিক ভাষা, একমাত্র পরিচয় হলো মানুষ এবং মানবিকতাই একমাত্র ধর্ম।' 'আচ্ছা বাবা, সমুদ্রের জল বেড়ে বেড়ে পৃথিবী তো ডুবে যেতে লাগলো তাহলে এই মানুষরা কোথায় থাকতো?' 'ওরাই তো আমাদের পূর্বপুরুষ রে – ওরা বানালো সমুদ্রের জলের নিচের এই ডোম গুলো। তুই তো জানিস এই সব ডোম শহরে যে বিশাল কম্পিউটার আছে সেই সামলায় সমস্ত রকম ঝক্কি ঝামেলা যেমন ধর ডোমের ভেতরের আবহাওয়া ঠিক রাখা, সমুদ্রের ঢেউ দিয়ে ভাসমান টার্বাইন চালিয়ে ও ভাসমান সোলার সেল দিয়ে সূর্যের আলো থেকে শহর চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রিসিটি তৈরি করা, সমুদ্রের জল শোধন করে খাবার জল সবার বাড়িতে পৌছে দেওয়া, এই রকম হাজারো দৈনন্দিন কাজ। সব থেকে বড় প্রয়োজনীয় ব্যাপার হলো খাদ্য - সমুদ্রের বিশাল খাদ্য ভাণ্ডারকে ব্যবহার করতে আমরা শিখেছি এ ছাড়াও গড়ে তুলেছি আলাদা আলাদা ডোমে ধান, গম, শাক সব্জির চাষ – ওখান থেকেই আমাদের সবার খাবার আসে আর ওই সব ক্ষেত, কারখানার সাথে যোগাযোগ তো টানেলের ভেতর দিয়ে মনোরেলেই হয়। সমস্ত ডোম শহরেই এই রকম ব্যবস্থা আছে। আর এই সমস্ত ডোম শহরগুলোর মধ্যে যোগাযোগও টানেলের ভেতর দিয়ে খুব দ্রুত

চলা ট্রেনে। তাছাড়া সমুদ্রের নিচের ধাতু তুলে এনে আমরা আমাদের দরকারের সমস্ত জিনিষই বানাই। তুই তো জানিস তোর মা শাক সবজি উৎপাদনের ওখানে কাজ করে আর আমি কাজ করি ওই ধাতু নিষ্কাশনের কারখানায়। তুই বড় হয়ে কি করবি সেটাও তো ওই বড় কম্পিউটার তোর জন্মের আগে থেকেই ঠিক করে দিয়েছে – তাই না?' 'হ্যাঁ বাবা, আমি বড় হয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের ওখানেই কাজ করবো। চল না একদিন মনোরেলে করে অন্য ডোম কারখানা গুলো দেখে আসি।' 'ঠিক আছে, আমি অনুমতি নিয়ে রাখবো আগামী রবিবার ওখানে যাবার। ওই দ্যাখ আমাদের ডোমের আকাশে সন্ধ্যে হয়ে এলো – আজ তো পূর্ণিমা তাই কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে। এবার তো বাড়ির দিকে যেতে হবে।' 'জানো বাবা, পুরাতন পৃথিবীতেও এই রকম চাঁদ উঠতো আকাশে – আমরা সিনেমাতে দেখেছ।' 'তবে কি জানিস, পুরাতন পৃথিবীর চাঁদটাই হলো সত্যিকারের চাঁদ – চাঁদ তো পৃথিবীর উপগ্রহ। আমাদের ডোমের আকাশে কৃত্রিম উপায়ে সমস্ত কিছুই সেই পুরাতন পৃথিবীর মতই করা হয়েছে যাতে আমরা বুঝতে না পারি যে আমরা সমুদ্রের জলের অনেক নিচে আছি তাই তো আজ পূর্ণিমা বোঝাতে এই গোল চাঁদ উঠেছে ডোমের আকাশে।'

স্যাংপো ও কিঞ্জল যখন নিজেদের মধ্যে গল্পে ব্যস্ত তখন শিমরান ভাবছিলেন আজ সকালে আসা মেইলের কথা। বড় কম্পিউটার জানিয়ে দিয়েছে এই ডোম পৃথিবী থেকে ওদের বিদায়ের দিন অবশ্য সেটা আরো পনের বছর পর যখন স্যাংপো নিজের পড়াশুনা শেষ করে কাজ শুরু করবে। জন সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর সবাইকেই এই ডোম পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় আর এই বয়স সীমা বড় কম্পিউটার ঠিক করে ঐ ব্যক্তির এই ডোমে প্রয়োজনীয়তার কথা হিসেব করেই। বেশীর ভাগ সময়ই স্বামী স্ত্রী একই সাথে বিদায় নেন – কিঞ্জলরাও তাই ঠিক করেছেন। সেই বিদায়ের দিনকে উৎসবের মতই পালন করা হয় শহরের কম্যুউনিটি সেন্টারে – সেখানে বিদায়ী লোকের পছন্দের খাবার, গান বাজনার ব্যবস্থা থাকে এবং এটা শহর কর্তৃপক্ষই করেন। দেখতে দেখতে পনের বছর কেটে গিয়েছে – স্যাংপো পড়াশুনা শেষ করে নিজের কাজে যোগ দেবার জন্য তৈরি আর কিঞ্জল ও শিমরনের এই ডোম পৃথিবী থেকে বিদায়ের দিনও এসে গেলো। সেদিন সকালে শিমরন সমস্ত বাড়ি পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখলেন এর পর যারা এখানে থাকবে তাদের সুবিধের জন্য – অবশ্য স্যাংপো ঠিক করেছে মা বাবার স্মৃতির এই বাড়িতে নিজেই চলে আসবে। আজ কিঞ্জল ও শিমরনের জন্য দেওয়া হয়েছে ফুল দিয়ে সাজানো বিশেষ গাড়ি - সেই বিশেষ গাড়িতে কম্যুনিটি হলে আসতে ওদের পছন্দের গান বেজে উঠলো – আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবরা ওদের বরণ করে নিয়ে এলো ফুল দিয়ে সাজানো মঞ্চের উপর - হৈ হৈ করে গল্প ও খাওয়া দাওয়ার মধ্যে দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো সেটা ওরা জানতে পারলেন যখন বেজে উঠলো ওদের বিদায়ের গান – দরজায় এসে দাঁড়ালো শেষ বিদায়ের গাড়ি। সবার সাথে আলিঙ্গন করে স্যাংপোকে আদরের চুমু দিয়ে শিমরন ও কিঞ্জল উঠে এলেন সেই গাড়িতে – সবার দিকে হাত নাড়তে নাড়তে বন্ধ হয়ে গেলো গাড়ির দরজা – শেষ হয়ে গেলো এই ডোম পৃথিবীর সাথে সব সম্পর্ক – রওয়ানা হলেন ওদের শেষ যাত্রায়। গাড়ির ভেতরে মৃদু আলো - সেতারে বাজছে বেহাগ – এক ধারে পাতা ধব ধবে সুন্দর বিছানা – তার পাশে সোফা সেট আর টেবিলে সাজানো ওদের পছন্দের নানা ফল, খাবার ও পানীয়। সোফায় বসে সেই প্রিয় পানীয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে দিতে শুরু হলো ওদের ছেলে বেলার গল্প, কত মিষ্টি ঘটনা, স্যাংপোর জন্ম, ওর ছোটবেলার দুরন্তপনা, এ রকম ওদের জীবনের আরো কত ঘটনার গল্প। চোখের পাতা ঘুমে ভারি হয়ে এলে চলে এলেন সেই নরম তুল তুলে বিছানায় – সেখানে কিঞ্জল ও শিমরন ঘুমিয়ে পড়লেন চিরকালের মত। ধীরে ধীরে বিছানা নিচু হয়ে ওদের নামিয়ে দিলো একটা ট্রলিতে যেটা ওদের নিয়ে এলো এক

বিরাট রকেটের অনেক ছোট ছোট কুঠরির মধ্যে একটাতে। রকেটের সমস্ত কুঠরি ভরে গেলে সেটা বিদায়ী শহরবাসীদের নিয়ে উড়ে যাবে সূর্যের দিকে।

অঞ্জন নাথ
ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

রাক্ষসের মত



চক্র দেখেছে রোজই তাদের বাড়ি এক ভিখারিনী আসছে।কোলে তার দু তিন বছরের একটা ছেলে। ছেলেটার নাম লচ্ছু।লচ্ছু! এধরনের নাম চক্র কোনো দিন শোনে নি।মাকে জিজ্ঞেস করে ছিলো ও,মা লচ্ছু আবার কেমন নাম?

মা বলেছিলেন নাম রাখার মত ওদের ভাবনা নেই বাবা!ওরা খিদের তাড়নায় সারা দিন ঘুরে বেড়ায়,তাই ছেলে মেয়ে হলে যা হোক একটা নাম রেখে দেয়।

সে দিন যখন ভিখারিনী লচ্ছুকে নিয়ে এলো,চক্র লচ্ছুকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল,ওর নাম লচ্ছু কেনো রেখেছ?

ম্লান হাসলো অন্নু ভিখারিণী,বলল,ওই রাম,লছমন আছে না,তার লছমন থেকে ওর নাম লচ্ছু রেখেছি।

--আমরা তো লক্ষণ বলি।তুমি লছমন বলছ কেনো?আবার প্রশ্ন করে চক্র।

অন্নু ভিখারিণী বলল,আমি তো বাঙালী নই,ছোট্ট বাবু!তাই--

--তা হলে তুমি বাংলা বলো কি করে?

--আমি ছোট বেলা এখানে চলে আসি।আর আমার লোক,মানে স্বামী--সে ছিলো বাঙালী।

--কোই তাকে তো কখনো দেখি নি!

--সে মোরে গেছে ছোট্ট বাবু.আজ দু বছর হলো।

এমনি সময় ঘরের ভিতর থেকে,চক্র,চক্র বলে মা ডাকতে লাগলেন।তাই আরও প্রশ্ন মনে জমা থাকলেও অবলা রয়ে গেলো।ঘরের ভিতর ঢুকতে হলো তাকে।

লচ্ছুকে দেখেছে চক্র।একটা রাক্ষস ছেলে।ওর মা রুটি,ভাত,বিস্কুট যখনি যা দেয় চক্র দেখেছে মহা পেটুকের মত খেতে থাকে লচ্ছু!ওর মা দু বার মুখে পুরল না পুরল ও গপগপিয়ে সব খেয়ে ফেলল।

মনে হলো সবটা বুঝি গিলে নিল!অবাক হোয়ে চক্র দেখতে থাকে।কোনো দিন লচ্ছুকে সে জিজ্ঞেস করে,আর খাবি লচ্ছু?লচ্ছু একটু হাসে,তারপর মাথা সামের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়।
চক্র ছুটে যায় ঘরের ভিতর।মাকে বলে,মা আর একটা রুটি দাও না। ওই লচ্ছু রাক্ষসটাকে দিয়ে আসি!
মা বলেন,ওরকম বলতে নেই বাবা!ওরা গরীব,ভালো খেতে পায় না,তাই খিদে ওদের পেটে সব সময় লেগে থাকে।কথা কটা বোলে চক্রের হাতে একটা রুটি তুলে দেন।
চক্র রুটি নিয়ে ছুটে গিয়ে লচ্ছুর সামনে তুলে ধরে।লচ্ছু এত ছোট তাও খপ করে ধরে নেয় রুটিটা।
চক্র মনে মনে বলে,কি লোভী বাবা!খাবার বেলা বড়দের মত কি লাফ ঝাপ দিয়ে উঠলো দেখো!
তারপর ও প্রকাশ্যেই অন্নু ভিখারিনীকে বলে উঠলো,তোমার ছেলে লচ্ছু রাক্ষস গো!
অন্নু কিছু বলল না,শুধু চক্রর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো।
হয়তো বলতে চাইল,তোমরা কি বুঝবে গো,মানুষ কোন জালায় রাক্ষস হয়!
এর পর থেকে যখনি অন্নু লচ্ছুকে নিয়ে আসত,চক্র তাকে দেখলেই বলে উঠতো,মা,মা,ওই রাক্ষস এসেছে।ঘরে খাবার আছে কিছু?

চক্র ক্লাশ থ্রীতে পড়ে।একটা প্রইভেট ইংরেজী স্কুলে।রোজ ভোরে গাড়ি আসে তাকে স্কুলে নিয়ে যেতে। স্কুলের ইউনিফর্ম পরে বইয়ের ব্যাগ ও জলের বোতল নিয়ে তৈরী থাকে।স্কুলের গাড়ি এসে হর্ন দিলো কি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ও।তড়িঘড়ি করে মা,বাবাকে,টা,টা,করে বাসে চেপে বসে।

সে দিন ও তাই হলো।নিয়ম মত স্কুলে পৌঁছালো।স্কুলের টিফিনে টিফিন বক্স খোলে চক্র।মা তার জন্যে অনেক খাবার দিয়েছেন।তিনটে রুটি,দু রকমের তরকারি,দু রকমের মিষ্টি,আর টিফিন বক্সের ভেতরের ছোট্ট বক্সে ভরা আছে ঘরের তৈরী মিষ্টান্ন!ও ভাবে কি যে করে না মা!এত কিছু সে কি খেতে পারে!এত খাবার দেখে লচ্ছুর কথা ওর মনে পড়ে যায়।ও যদি থাকত তো খাবার গুলো আর নষ্ট হতো না।

তাড়াতাড়িতে সে দিন বিজন টিফিন বক্স আনতে ভুলে গেছে।টিফিনের সময় পর্যন্ত তার ঘর থেকে কেউ টিফিন বক্স পৌঁছালো না।চক্র বলল,আয় আমরা একসঙ্গে বসে টিফিন খেয়ে নিই।আমার কাছে অনেক খাবার আছে।

বিজন এক দু বার আপত্তি করে শেষে এক সঙ্গে বসে ওরা ভাগাভাগি করে টিফিন খেয়ে নিল।একটু পরেই বিজনের টিফিন নিয়ে ঘরের লোক পৌঁছালো।কি হবে সে টিফিন বক্স!তেমনি ভরা পড়ে রইল।

সে দিন অনিবার্য কোন কারণে স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হোয়ে গেলো।চক্রর পেট ভালো ছিলো না।দু তিন বার মেমকে বলে টয়লেটে গিয়েছে।পেটটা আবার কেমন যেন মোচড়াচ্ছিলো।শরীর কেমন দুর্বল লাগছিল।ছুটির ঘন্টা পড়ার পর ক্লাশ ছেড়ে সবাই বেরিয়ে গেলো।যাবার আগে দু চারজন ওকে ডেকে গেলো।কিন্তু পেটের ব্যথায় কাতর চক্র বইয়ের ব্যাগ আর জলের বোতল নিয়ে টয়লেট পরিসরের ভিতরে ঢুকল।হাতের বোতল,ব্যাগ বাইরে রেখে টয়লেটের ভিতরে ঢুকে গেলো সে।ডিসেনট্রির মত হোয়ে গেছে তার।মনে হচ্ছিল আরও একটু,আরও একটু বসলে ভালো হতো!বার বার পেটের ভিতরে একটা নিম্ন চাপ অনুভব করছিল।

এমনি আধঘন্টা কেটে গেলো,তাড়াহুড়োতে স্কুলের বাসে চক্র ওঠেনি এটা কেউ লক্ষ্য করল না।বাস

ছেড়ে দিলো।চক্রর ঘরের সামনে এসে হর্ন দিলো গাড়ির ড্রাইভার।কেউ নামল না।কেউ জিজ্ঞেস করল না যে চক্র কোথায়!ড্রাইভার মনে করতে পারলো না সকাল বেলা এ ঘরের ছেলেটা বাসে উঠে ছিলো কি না।ছাত্রদের ওঠানো নামানোর লোকটা মনে করল ছেলেটা হয়তো ছুটি নিয়ে গার্জিয়ানের সঙ্গে বাড়ি চলে এসেছে।যেমনটা মাঝে মোধ্যে হোয়ে থাকে।নিয়মিত সময়ের আগে স্কুলের বাস এসে চলেগেল,চক্রর ঘর থেকে কেউ তা লক্ষ্য করল না।

এদিকে স্কুল পাহারাদার,চৌকিদার ওরা পুরোপুরি এক বেলার ছুটি পেয়ে গেছে।ওরা ক্লাশ ঘরের বাইরে টাইরে ভালো ভাবে দেখে শুনে নিল।স্কুল ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করল।মেন গেটগুলোতে তালা লাগিয়ে ঘরের দিকে চলে গেলো।

চক্র যখন নিজেকে একটু সামলালো,টয়লেট থেকে ও বেরিয়ে এলো।বইয়ের ব্যাগ আর জলের বোতল হাতে তুলে টয়লেট পরিসরের বাইরে বেরিয়ে এলো।

আরে,স্কুল একেবারে ফাঁকা,একজন স্টুডেন্টকেও ও দেখতে পেল না।না মেম, না দারোয়ান,না চৌকিদার কেউ নেই!মেনগেটের সামনে হাজির হলো ও।কিন্তু একি,গেট যে বন্ধ হোয়ে গেছে!ও জোরে জোরে ধাক্কা দিলো গেটে,গেট খোলার চেষ্টা করল।না,গেট বাইরে থেকে বন্ধ!কান্না পাচ্ছিল চক্রর।ও জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো,চীত্কার করে দারোয়ান,চৌকিদারদের ডাকতে লাগলো।না,কারো কোনো সাড়া নেই!ও চীত্কার করে উঠলো,গার্ড আঙ্কেল,গার্ড আঙ্কেল!কেউ এলো না,কেউ তাকে গেট খুলে দিয়ে গেলো না!

হঠাৎ চক্রর মনে পড়ল,স্কুলের পেছন দিকে আরও একটা গেট আছে।মনে পড়া মাত্র ও কানতে কানতে ছুটে চলল পেছন দিকের গেটের কাছে।দূর থেকেই দেখল গেট বন্ধ।তবু গেটের কাছে এলো,জোরে জোরে ধাক্কালো।এখানেও চীত্কার করে ডাকতে থাকলো গার্ড আঙ্কেল,গার্ড আঙ্কেল,বলে।

কেউ এলো না,কেউ তার ডাক সুনতে পেল না।পেছন গেটের পাশেই ও ব্যাগ, জলের বোতল নিয়ে মেঝেতে লেপটি মেরে বসে গেলো।ও হতাশায় দুটো পা সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল।এখন আর কাঁদতে পার ছিলো না ও,মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল।শরীর শিহরণ দিয়ে উঠছিল।

--মা,মা,মা,কাতর ভাবে বলে উঠলো ও।মা তুমি কোথায়!আমায় এসে নিয়ে যাও,মা!একটু থেমে আবার বাবাকে ডাকতে থাকলো,বাবা,বাবা,বাপি তুমি কোথায়,তুমি কোথায়?ওর দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকলো।

বেলা তিনটে বেজে গেলো।চক্র ঘরে আসে নি এখনো।খোঁজ,খোঁজ,খোঁজ,কোথায় চক্র?স্কুলে ফোন লাগানো হলো।স্কুলের ফোন বাজতে থাকলো,কেউ উঠালো না।কেবল স্কুলের অফিস ঘরের ফোনের ঝংকার চক্রকে উতলা করে তুলল।ছুটে এসে ও দেখল স্কুলের অফিস ঘরে ফোন বেজে চলেছে। কিন্তু কি করবে ও?অফিস ঘরেও লাগা ছিল বড় এক তালা! ও অসহায়ের মত কেবল ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

চক্রর মা আশপাশের বাড়িতে খোঁজ নিতে গেলেন--যেখানে চক্র মাঝে মাঝে ঘুরতে যায়।না,কোথাও সে নেই।আশপাশের অলিগলি মাঠ,ঘাট কোথাও ও নেই!

চক্রর বাবা গাড়ি নিয়ে চলে এলেন স্কুলে।না,সমস্ত স্কুল বিল্ডিঙ্গের বাইরেটা তখন খা খা করছে,কোথাও

একটা জনপ্রাণীর দেখা নেই।তবু তিনি গাড়ি থামিয়ে নীচে নাবলেন।স্কুলের মস্ত গেটে বড় তালা ঝুলছে দেখলেন।মনে একবার সন্দেহ হলো,এমন তো নয় চক্র স্কুলের ভিতর আটকা পড়ে আছে!পর মূহুর্তে মনে হয়েছে,না,এমন হয় না,বাচ্চাদের স্কুলে এমন ঘটনার নজির নেই বললেই চলে।তবু মেন গেটে গিয়ে তিনি কান পাতলেন।না,কোনো সাড়াশব্দ নেই।দরজায় একবার,দুবার থপ থপ করলেন।না ভেতর থকে কোনো আওয়াজ এলো না!

বেলা পাঁচটা বেজে গেলো।স্কুলের স্টাফের কাছ থেকে চৌকিদারের ঘরের লোকেশন জেনে নিয়ে চক্রর বাবা আর পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক গেলেন চৌকিদারের কুয়াটার্সে।চৌকিদার ছিলো না,ও বাজারে গিয়েছিল।অনেক সময় অপেক্ষার পরও যখন চৌকিদার ফিরল না,তখন ওঁরা সোজা চলে এলেন পুলিশ থানায়।সেখানে চক্রর মিসিং রিপোর্ট করা হলো।

রাত আটটা বেজে গেলো।চক্রর ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেলো।মা অঝরে কেঁদে চলেছেন।কান্নার মোধ্যে বলে চলেছেন,আমার ছেলেকে এনে দাও,আমার ছেলে কে এনে দাও গো।বাবা স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে আছেন,চোখে তার জলের ধারা।চক্র তাঁদের এক মাত্র সন্তান।

চক্র চুপ করে বসে আছে।মাঝখানে সামনের গেটের থেকে ঠুক ঠাক শব্দ এসে ছিলো।ও পাগলের মত টলতে টলতে ছুটে গিয়ে ছিলো।গেটের কাছে পৌঁছাতে তার দেরী হোয়ে গিয়েছিল।ততক্ষণে ওর বাবা স্কুলের গেটে দু তিন বার ধাক্কা দিয়ে চলে গিয়ে ছিলো নিজের কারের কাছে।চক্র শুধু একটা গাড়ির স্টার্ট দেবার শব্দ পেয়েছিল।ভাঙা গলা নিয়ে সে প্রাণপণ চীত্কার করেছিল।কিন্তু কারো কান পর্যন্ত সে চীত্কার পৌঁছায় নি।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এলো।ভীষণ ভয় করছিল চক্রর।সামান্য শব্দ কানে এসে বাধছিলো।হাওয়ার শন শন শব্দ,মশার ঝাঁকেদের ওড়ার শব্দ,আর দূরের লোকালয়ের কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসছিল। আর পারছিলো না সে--চীত্কার করতে করতে ওর গলা শুকিয়ে গেলো,ভয় পেতে পেতে ওর শরীরে কেমন জড়তার ভাব এসে গেলো।তার ওপর সারা দিনের না খোয়াতে তার শরীর দুর্বল হোয়ে পড়েছে। আর চলতে পারছে না ও।ব্যাগ আর জলের বোতল পেছনের গেটের কাছে পড়ে রইল।সামনের গেটের কাছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ধুপ করে বসে পড়ল।দু পা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে দু হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে চুপচাপ শরীর এলিয়ে পড়ে রইল।

রাত তখন সারে দশটার কাছাকাছি।রিক্সা থেকে নামল দারোয়ান ও চক্র।চক্রকে কোলে করে নামাতে হলো।সদর দরজা আজ খোলাই ছিলো।রিক্সার সামান্য শব্দ শুনেই চক্রর মা,বাবা,এক সঙ্গে দরজার বাইরে বেরিয়ে এলেন।দারোয়ানের কোলে চক্রকে দেখে,চক্র,চক্র বলে ছুটে এলেন তাঁরা।

মা চক্রকে জড়িয়ে ধরলেন,বলে উঠলেন,কি হয়েছে বাবা!কি হয়েছে তোমার!কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা। বাবা হতবাক হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।তাঁর চোখের কোন ভিজে যেতে লাগলো।

দারোয়ান করুণ সুরে বলে উঠলো,বাবু!,ভয়ে তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।হঠাৎ সে চক্রর বাবার পা জড়িয়ে ধরলো,বাবু! আমায় মাপ করুন।আমি দোষ করেছি,বাবু!

ছেলে স্কুলে আটকে পড়েছিল জানতে পেরে সত্যি রাগে কান্ডজ্ঞানহীন হোয়ে পড়লেন তিনি।দারোয়ানকে ঠাস,ঠাস,চড় মারতে লাগলেন।

দারোয়ান কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠে,আরও মারুন,বাবু সাব,আরও মারুন।
--দাঁড়া,আমি তোকে পুলিশে দেবো,তোকে আমি ছাড়ব না,চক্রর বাবা ভীষণ উত্তেজিত হোয়ে গেলেন।
দারোয়ান হাত জোড় করে কাঁদো কাঁদো হোয়ে বলে ওঠে,বাবু সাব,আরও মারুন আমায়,হাত দিয়ে মারুন,লাঠি দিয়ে মারুন,চাবুক এনে মারুন,কিন্তু বাবু, হাতে মরুন,আমায় ভাতে মারবেন না।আমারও সংসার আছে,বৌ,ছেলে,মেয়ে,আছে। ওদের পেটে লাথি মারবেন না বাবু!

আস্তে আস্তে শান্ত হতে লাগলেন চক্রর বাবা।ভাবলেন,কি হবে গরীবের পেট মেরে। ঘটনা যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে।দারোয়ানকে ছেড়ে দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলেন।ছেলে তার মার কোলে কেঁদে চলেছে তখনও,বাবাকে দেখে চক্র আরও ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠলো।বাবা কোলে তুলে নিলেন ওকে।মুখ দিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ কথা সরল না,কেবল,বাবা,বাবা,বলে ডেকে উঠলেন তিনি।

রাত এগারোটা কোথা দিয়ে বেজে গেলো কেউ টের পেল না।ঘটনার উত্তেজনা খুব ধীরে ধীরে হলেও শান্ত হোয়ে আসছিল।চক্র নিজেকে সামান্য সুস্থ অনুভব করছিল। এবার তার পেট খিদেতে মুচড়ে উঠলো।ও ক্ষীণ কন্ঠে বলে উঠলো,মা,খুব খিদে পেয়েছে,মা!

মা তাড়াতাড়ি ছেলের খাবার থালে বেড়ে ওর মুখের সামনে তুলে ধরলেন।ছেলের অসুবিধা হবে ভেবে তিনি খায়িয়ে দিতে লাগলেন।খিদে আর সহ্য হচ্ছিল না,খুব তাড়াতাড়ি খেতে থাকলো চক্র।খিদের মুখে তার কাছে সব খাবার খুব ভালো লাগছিলো।মার দেবার আগেই ও খেয়ে নিচ্ছিল।পরের গ্রাসের জন্যে হাঁ করে বসে থাকছিল।গপাগপ সে থালের সমস্ত খাবারগুলি খেয়ে নিল।ঢকঢক করে পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে নিল।এবার অনেকটা শান্ত হোয়ে চক্রর মনে পড়ে গেল একটা কথা।ও মাকে ডেকে বলল,মা,আমি আর লচ্ছুকে রাক্ষস বলব না,মা!
মা জিজ্ঞেস করলেন,কেনো,বাবা?
চক্র ধীরে ধীরে বলে উঠলো,আজ আমার এত খিদে পেয়েছিল,মা,দেখলে আমিও না রাক্ষসের মত সব গপাগপ খেয়ে নিলাম--ঠিক লচ্ছুর মত!

তাপসকিরণ রায়
জবলপুর, মধ্য প্রদেশ

বিদেশী রূপকথা: সাবান বিক্রেতার ছেলে



অনেক, অনেকদিন আগে, পারস্যে এক পবিত্র শহর ছিল মেশেদ, যার সোনালি মিনারওয়ালা সুন্দর মসজিদ পারস্যের গর্ব ছিল। এই মেশেদে আব্দুল্লাহ নামে এক ভাল মানুষ থাকত। সে সাবান বেচে কোনমতে দিন গুজরান করত।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি, সে সারা শহর চষে বেড়াত, আর চিৎকার করতঃ
"ভাইসব, আমার এই সুন্দর সাবান নাও। এই শহরে এর থেকে ভাল সাবান আর নাই, আর সবাই সেটা জানে। ছোট্ট খোকারা কথা বলতে পারলে তারাও একই কথা বলত।"

কিন্তু তাও, তুমি যদি খুব কাছ থেকে ভাল করে দেখ, তোমার সেটাকে সাবান বলে মনে হবে না। সেটা ছিল কালো আর খসখসে, অনেকটা কাঠের মত দেখতে। যদি কোন দুর্ভাগা পথিক সেই সাবান নিজের হাতে বা মুখে মাখত, তাহলে তার চামড়া আগুনের মত জ্বলত। কিন্তু এটা খুব বেশি ঘটত না, কারণ পারস্যে লোকজন গায়ে বেশি সাবান মাখত না, বা কাপড়েও সাবান ঘষত না, আর বাসনকোসন মাজার জন্য বালিই যথেষ্ট ছিল। তাই অনেকদিনই এমন হত যে বেচারা আব্দুল্লাহ নিজের আর নিজের ছোট্ট ছেলে আহমেদের জন্য খাবার কেনার জন্য যথেষ্ট পয়সা যোগাড় করে উঠতে পারত না।

এইরকম সব সময়ে আব্দুল্লাহ তার ছোট্ট মাটির তৈরি কুঁড়েঘরে গুটিসুটি মেরে ঢুকে পড়ে, দুই হাতে মুখ ঢেকে রাখত, যাতে তাকে ক্ষিদেয় কাতর তার ছেলের চোখের জল দেখতে না হয়। তার দশ বছরের ছোট ছেলে, তার বাবাকে সান্ত্বনা দিত এই বলেঃ

"ইনশাআল্লাহ, তুমি গত কয়েক সপ্তাহের থেকে বেশি সাবান কালকে বিক্রি করতে পারবে।" তার বাবা, তার ছেলের উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সাহস যোগাত, আর প্রার্থনা করত, তাই যেন হয়।

কিন্তু দিন কেটে যেতে লাগল আর অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকল, যখন একদিন একটা ঘটনা ঘটল। ছোট আহমেদ ইশকুলে যাচ্ছিল, আর সেদিন সূর্যের তেজ খুব প্রখর ছিল। সে তখন বড় রাস্তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া নালার দুইপাশে সাজানো খেজুর গাছের ছায়ার আশ্রয় নিল। সেখানে মহিলারা জলের পাত্র ভর্তি করছিল, কেউ বা কাপড় কাচছিল; এক সারি উট দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছিল, পাড়ে দাঁড়িয়ে একপাল গাধা জল ছিটাচ্ছিল, কয়েকজন নতুন রঙ করা কাপড় নিংড়োচ্ছিল, সেই রঙিন জল নানা রঙা ঢেউ হয়ে বয়ে চলেছিল।

আহমেদ যখন এইসব দেখার জন্য দাঁড়াল, সেই সময়ে, একজন দরবেশ, শিকলে বাঁধা একটা সিংহ

নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। তার পেছনে পেছনে অদ্ভূত টুপি আর জামা পড়া কতগুলি লোক এসে দৌড়ে দৌড়ে বলতে লাগলঃ

"বাদশাহের জন্য পথ ছাড়! সবাই দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও!" বলতে বলতেই একটা দারুণ সুন্দর সাজানো আরবী ঘোড়ার পিঠে চেপে বাদশাহ এগিয়ে এলেন, তাঁর চারিদিকে সশস্ত্র দেহরক্ষী। তারপরে চারজন বাহকের কাঁধে চেপে এল এক পালকি। এই শোভাযাত্রা এসে দাঁড়াল ঠিক যেখানে আহমেদ দাঁড়িয়ে ছিল। সেই পালকি থেকে নেমে এল ওড়নায় মুখ ঢাকা এক শাহজাদী। শাহজাদী পাশের বাজারের এক দোকানে রূপোর জিনিষ পছন্দ করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু সে দোকানে পৌঁছানোর আগেই লোকজনের মধ্যে এক মহা কলরব সৃষ্টি হল। দরবেশের সিংহটা শিকল ছিঁড়ে পাগলের মত এদিক সেদিকে লাফ দিচ্ছিল, আর লোকজনকে তাড়া করছিল। মহিলারা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল, পুরুষেরা পালাল, ছোট বাচ্চারা ভয়ে কাঁদতে লাগল, কেউ কেউ নালায় ঝাঁপ দিল, ঘোড়াগুলি ভয় পেয়ে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে লাগল। মহা হট্টগোল লেগে গেল।

সেই সময়ে এক লাফ দিয়ে সিংহটা শাহজাদীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল; কিন্তু তাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার আগেই, আহমেদ এক লাফ দিয়ে এগিয়ে এল, আর পাশের এক কামারের দোকান থেকে লাল গনগনে একটা লোহার টুকরো তুলে নিয়ে, সোজা সিংহের মুখের দিকে ছুঁড়ে দিল। প্রচন্ড যন্ত্রণায় আর রাগে সিংহটা শাহজাদীকে ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে দৌড় লাগাল।

ভয় একটু কমতেই, শাহজাদী আহমেদকে কাছে আসতে বললেন, আর নিজের মুখের ওড়না সরিয়ে তাকে বললেন সে একজন সাহসী ছোট্ট ছেলে, আর তাঁর একজন পরিচারক কে বললেন তাকে এক বটুয়াভর্তি সোনা দিতে। আহমেদ এত সুন্দরী আর কাউকে কোনদিন দেখেনি, আর এমন অবাক হয়েছিল, যে সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল, ধন্যবাদ বলতে ভুলে গেলে, আর তার সামনে নিয়ে শোভাযাত্রা চলে গেল।

সেই টাকা ব্যয় করে কিছুদিন চলল, কিন্তু যখন সেই টাকা শেষ হয়ে গেল, আহমেদ আর তার বাবা আবার কষ্টে পড়ল। একজন ব্যবসায়ী তার বাবাকে বলল রাজ্যের রাজধানীরে ব্যবসা অনেক ভাল চলে। সেই শুনে তারা রাজধানীর দিকে যাত্রা শুরু করল, যদিও সেই পথ ছিল অনেক দূর আর বিপদে ভরা। "শহরের মধ্যে মরার থেকে মরুভূমিতে মারা যাওয়া অনেক ভাল, " বলল আহমেদ।

তাই তারা তাদের যাত্রা শুরু করল, কখনও পাহাড়ের পাকদন্ডী বেয়ে বেয়ে, কখনও মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। তাদের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, ক্ষিদে- তেষ্টায় প্রাণ শুকিয়ে গেল, তার মধ্যে সবসময়ই ছিল ডাকাতের ভয়।

প্রচন্ড গরমে এবং হিংস্র ডাকাতদের ভয়ে তারা রাত্রে পথ চলত।। চাঁদের আলোয় বড় পাথরের ছায়া দেখলেই তাদের মনে হত ঘোড়ায় চড়া এক ডাকাত। দিনের বেলা তারা পথের ধারে ছোট্ট ছোট্ট পান্থশালাগুলিতে ঘুমাত। আহমেদ অন্যান্য পথিক ব্যবসায়ীদের টুকটাক কাজ করে দিত, তার বদলে পেত রুটি অথবা একমুঠো ভাত, অথবা কিছু শুকনো ফল যা দিয়ে তারা পেট ভরাত।

এইরকম চলতে থাকল, তারপর এক রাতে, যখন তারা লবণে ভরা নদী পার হওয়ার জন্য সেতুটা খুঁজছিল, আকাশ হটাত করে কালো মেঘে ঢেকে গেল, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়তে লাগল, আর দ্রুত নদীর

জল ফুলে ফেঁপে উঠল। চাঁদ ওঠার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া ওদের আর কিছু করার ছিল না। জোর হাওয়া ওদের আক্রমণ করতে লাগল, বৃষ্টি ওদের ভিজিয়ে দিল। চারিদিকে বন্য জন্তুর ডাক শোনা যেতে লাগল। ওরা পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

একবার, যখন বাতাসের তেজ একটু কম হল, অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা গোঙ্গানির আওয়াজ ভেসে এল। সেই শব্দ শুনে আব্দুল্লাহ আহমেদকে বলল, "একদম চুপ করে বসে থাক বাছা, কারণ এটা হল মরুভূমির বুড়োর আওয়াজ।"

এখন, আহমেদ কোন দিন মরুভূমির বুড়োর কথা শোনেনি, তাই তার মনে কোন ভয় ছিল না, তাই তার বাবা তাকে বারণ করা সত্বেও, সে উঠে আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছিল সেইদিকে চলল। যখন সে সেইখানে পৌঁছাল, তখন মেঘের পেছন থেকে চাঁদ বেরিয়ে এল, আর আহমেদ দেখতে পেল এক গরীব দরবেশ বালির ওপর পড়ে আছে। তার কাঁধের ওপরে একটা চিতাবাঘের চামড়া ফেলা ছিল। তার পাশে রাখা ছিল বড় বড় পেরেক গাঁথা একটা লাঠি, আর দান গ্রহণ করার জন্য একটা কুমড়োর খোলের পাত্র।"

"আল্লাহর নামে আমাকে একটু জল দাও," সেই দরবেশ আহমেদকে দেখে বল্লেন। আহমেদ তার জলের পাত্র ভরে নদী থেকে জল এনে দিল।

জল পান করে সেই দরবেশের যেন একটু স্বস্তি হল। তিনি বললেন, " আমি আলি, আমাকে সারা পারস্যের সবাই চেনে। আমি দুই মাস আগে মেশেদ যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম। কিন্তু গতকাল থেকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমি বুঝতে পারছি আমি আর বাঁচব না।
তুমি আমার সঙ্গেথাক। আমি একটু পরেই মারা যাব। আমি মারা গেলে, আমার গলায় ঝুলতে থাকা এই ছোট্ট চামড়ার থলেটা নিয়ে নিও, তার ভেতরে তুমি পাবে একটা ছোট্ট স্ফটিকের পাণপাত্র, যেটাকে তুমি সঠিক ভাবে ব্যবহার করলে জীবনে অনেক শক্তি আর অর্থ পাবে।

প্রতি সকালে তুমি যখন ঘুম থেকে উঠবে, এই পাত্রের ভেতরে একফোঁটা পরিষ্কার জল ফেলবে, আর খুব ভাল করে তার দিকে লক্ষ্য রাখবে। যদি তোমার বা তোমার প্রিয়জনেদের কোন বিপদ আসে, তাহলে সেটা এই জলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে। আর যদি..." বলতে বলতে তাঁর শক্তি ফুরিয়ে এল, তাঁর মাথা হেলে পড়ল, তিনি মারা গেলেন। আহমেদ থলেটা আর স্ফটিকের পাত্রটা খুঁজে পেল, ঠিক যেমন দরবেশ বলেছিলেন, এবং তার বাবার কাছে ফিরে গিয়ে সব কথা খুলে বলল।

দরবেশ যেমন বলেছিলেন, আহমেদ ঠিক সেইরকম প্রতিদিন সকালে করতে থাকল, কিন্তু সে সেই স্ফটিকের পাত্রের ভেতর কিছুই দেখতে পেল না। তখন সে অভ্যাসটা ছেড়ে দিল। তারপরে একদিন এল, যেদিন এক হটাত ধূলোর ঝড়ে দিগবিদিক ছেয়ে গেল। ধূ ধূ বালির ওপর দিয়ে বাতাস উড়ে যেতে লাগল, আকাশ এবং সূর্য ঢেকে গেল, বাতাস ধূলোয় ভরে গেল, আর বাতাসে উড়ে আসা ছোট পাথরের টুকরোগুলি তাদের ক্ষতবিক্ষত করে দিল। চারিদিকে কোন আশ্রয় ছিল না।

ভয়ে আর যন্ত্রণায় তারা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল, আর যখন অনেক ঘন্টা পরে, ঝড় থেমে গেছে, তখন তারা একে অপরকে দেখতে পেল না। তারা সেই নিষ্ঠুর মরুভূমিতে হারিয়ে গেছিল, তাদের কাছে খাদ্য তো দূর, জলই ছিল না। হতাশায় কাঁদতে কাঁদতে, আহমেদ এগিয়ে চলল, ঠিক যেন

স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার মত। চলতে চলতে সে পাথর আর কাঁটাঝোপের ওপর পড়ে যেতে থাকল,কিন্তু তাও সে এগিয়ে চলল। এইভাবে এক সময় এক যখন সে আর এগোতে পারল না, সে বালিতে পড়ে গেল, আর তার মনে হল সে মরেই যাবে।

অনেক্ষণ ধরে সে ঘুমিয়ে ছিল, তারপরে কে যেন তাকে নাড়িয়ে দিয়ে তার ঘুম ভাঙাল। চোখ খুলে, সে দেখতে পেল এক বুড়ো মানুষ তার দিকে তাকিয়ে হাসছে আর বলছে, " আরে, এ তো দেখছি আহমেদ, সাবানওয়ালা আব্দুল্লাহের ছেলে। তুমি আমাকে চেন না আহমেদ? আমি তোমার চাচা। পথ হারিয়ে ফেলেছ বলে কেঁদনা। এস, আমার হাত ধর আর আমরা তোমার বাবাকে খুঁজে বার করব চল।"

আহমেদ ভাবতে লাগল সে কেন কোনদিন এই চাচাকে দেখেনি বা তার আব্বার কাছে এর সম্পর্কে শোনেনি। তবুও সে আব্বাকে খুঁজে পাওয়ার আশায় সেই বুড়োর সাথে চলল। অনেক অনেক পথ তারা পেরিয়ে গেল, কিন্তু তার আব্বাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন সে কেঁদে ফেলে বসে পড়ল, আর বললঃ"আমি এত ক্লান্ত, আমি আর চলতে পারব না।" আর সেই বুড়ো উত্তর দিলঃ "ঘুমাও বাছা, আমি সব দিকে নজর রাখছি।"

কিন্তু আহমেদ যখনি চোখ বুজতে গেল, সেই বুড়ো পিছু ফিরল, আর আহমেদ দেখল তার পা গুলো ভেড়ার মত সরু সরু। সে ভয়ের চোটে চিৎকার করে উঠল, "ঘুল, ঘুল"। ঘুল ছিল মরুভূমির রাক্ষস। আহমেদ অজ্ঞান হয়ে যেতে সে আহমেদের রক্ত খাওয়ার জন্য তার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

কিন্তু আহমেদের চিতকারের জবাব এল আরেকটা চিতকারে, আর সেখানে এসে উপস্থিত হল এক সুন্দরী মেয়ে, গলায় তার সোনা -রুপোর পুঁতির মালা। সেই মালার দিকে চোখ পড়তেই সেই বুড়ো বিদ্যুতগতিতে উড়ে চলে গেল, কারণ ধাতু দেখলে তার খারাপ ক্ষমতাগুলি সব লুপ্ত হত।

এই মেয়েই ছিল সেই শাহজাদী যার জীবন আহমেদ মেশেদে বাঁচিয়েছিল। তার বাবা, সেই বাদশাহ, ধর্মস্থান দর্শন করে ফিরছিলেন, আর সঙ্গে আসা রক্ষীদের সাথে মজা করার জন্য শাহজাদী অন্য পথে চলে আসে, আর আহমেদের দেখা পেয়ে যায়। তার অনুরোধে, আহমেদ বাদশাহের সাথে চলতে থাক্ল। চলার পথে পরের দিন তারা আহমেদের আব্বাকেও খুঁজে পেল। সবাই মিলে তখন রাজধানীর দিকে চলতে থাকল।

রাজধানী থেকে তিন দিনের দূরত্বে, কাজবিনের কাছে পর্বতের উপরে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে থাকত পর্বতের বুড়ো, যে ঘাতকদের রাজা নামে পরিচিত ছিল। তার এতই ক্ষমতা ছিল যে তার এক হুকুমে তার অনুগতেরা দূর-দূরান্তে গিয়ে তার শত্রুদের মেরে আসতে পারত, সেই শত্রু যতই শক্তিশালী হোক না কেন।

যখন সে শুনল পারস্যের বাদশাহ তাকে এবং তার সঙ্গীসাথীদের ধ্বংস করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছে, সে তখন খুব রেগে গেল, আর নিজের একজন সংগীকে ডেকে বলল, "যাও, পারস্যের বাদশাহকে মেরে ফেল।" সেই লোকটা রুটি, জল আর এটা ধারালো ছোরা নিয়ে চলে গেল।

এদিকে, মরুভূমির বুড়োর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার পর থেকে আহমেদ প্রতি সকালে সেই স্ফটিকের পাত্রে এক ফোঁটা করে জল ফেলে তার ভেতরে দেখত। এক সকালে সে সেই জলের ফোঁটার ভেতরে

দেখতে পেল বাদশা ঘুমিয়ে আছেন, আর তাঁর পাশে এক ডাকাত দাঁড়িয়ে আছে, খোলা ছোরা উদ্যত করে। সে তাড়াতাড়ি বাদশাহের কাছে ছুটে গেল এবং তাঁকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করল, কিন্তু বাদশাহ ব্যাপারটা শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি তাঁর রক্ষীদের ভরসা করতেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, আহমেদ ঠিক করল সে খেয়াল রাখবে। অধকার নেমে এল, আর রক্ষীরা সব ঘুমিয়ে পড়ল। প্রাসাদ নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল। প্রহর কাটতে লাগল, চেয়ে থাকতে থাকতে আহমেদ ক্লান্ত হয়ে পড়ল, এমন সময়ে সে দেখতে পেল একটা ঘন কালো ছায়ামূর্তি বাদশাহের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সেই ছায়ামূর্তি যখন বাদশাহের একদম কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন আহমেদ তার ওপরে লাফ দিয়ে পড়ল, এবং চিৎকার করতে শুরু করল। সারা প্রাসাদ জেগে উঠল, এবং রক্ষীরা অপরাধীকে ধরে ফেলল।

যখন সেই লোকটা আর ফিরে গেল না, তখন পর্বতের বুড়ো আরেকজন কে পাঠাল, তারপরে আরেকজনকে এবং সবশেষে তার সবথেকে সেরা সহচরকে পাঠাল। কিন্তু আহমেদের স্ফটিকের পাত্রের জন্য, বাদশাহকে মারার সমস্ত মতলব বিফলে গেল।

বাদশাহ তখন আহমেদকে ডেকে পাঠালেন, আর বল্লেনঃ" তুমি এতবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, কি পুরষ্কার চাও বল।" আহমেদ তখন মনে সাহস যুগিয়ে বলল-" অর্থ বা শক্তি কিছুই চাই না, আমি শাহজাদীকে শাদী করতে চাই।"

"তার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে আমারও কোন আপত্তি নেই।" বললেন শাহজাদা।শাহজাদীর কোন আপত্তি ছিলনা, তাই আহমেদের সাথে তার শাদী হয়ে গেল, আর আহমেদ হয়ে গেল শাহজাদার প্রধাণ উজির।

পারস্যের রূপকথা
অনুবাদঃ
মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

পড়ে পাওয়া: আরে অর্থাৎ



আমাদের স্কুলের বুড়ো হেড পন্ডিতমহাশয় মরিয়া গেলে যিনি নূতন হেডপন্ডিত নিযুক্ত হইয়া আসিলেন, তাঁহার নামা শ্রীরমানাথ বিদ্যাভূষণ। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে বি.এ. পাশ করিয়াছিলেন। নূতন পন্ডিত মহাশয়ের বয়স বেশি নহে- বোধ হয়, তেইশ-চব্বিশ বৎসর হইবে। বয়স কম হইলেও তিনি খুব পন্ডিত ছিলেন, পড়াইতেও খুব ভাল পারিতেন। কিন্তু তাঁহার একটা মুদ্রাদোষ বড়োই প্রবল ছিল। তিনি একটা কথা বলিতে গেলে তাহার মধ্যে দশটা 'আরে অর্থাৎ' বলিতেন। এই কথাটিই তাঁহার কাল হইয়াছিল।

প্রথম যেদিন তিনি আমাদের শ্রেণিতে পড়াইতে আসিলেন, সেদিন তাঁহার এই 'আরে অর্থাৎ' শুনিয়া ক্লাসশুদ্ধ ছেলে হাসিয়া অস্থির হইয়াছিল। আমাদিগকে হাসিতে দেখিয়া পন্ডিতমহাশয় বড়োই লজ্জিত হইলেন। কিন্তু আমাদের হাসির কারণ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, 'তোমরা- আরে অর্থাৎ- হাসো কেন?শিক্ষকের সহিত- আরে অর্থাৎ- এমন ব্যবহার করা- আরে অর্থাৎ- কি ভালো?' ইহাতে হাসি থামিবে কেন, আরও বাড়িয়া চলিল। কলিকাতা শহরের বড়ো স্কুল, আমরা উচ্চশ্রেণির ছাত্র, আমাদের অনেকের অবস্থাও ভালো। তিনি নূতন লোক, সেই দিন প্রথম কার্যে উপস্থিত হইয়াছেন- এ অবস্থায় আমাদিগকে তিরষ্কার করিতে পারিলেন না। হেডমাস্টারের নিকট যে অভিযোগ করিবেন, সে সাহসও তাঁহার হইল না। তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'তোমরা- আরে অর্থাৎ- হাসিও না। ' কিন্তু কাহার কথা কে শোনে। আমরা সেই একদিনেই 'আরে অর্থাৎ' শিখিয়া ফেলিলাম এবং সেই দিনেই এই নূতন পন্ডিতমহাশয়ের নাম হইল 'আরে অর্থাৎ"।

তারপরে সেই 'আরে অর্থাৎ' পন্ডিতমশাইয়ের কি হল? জানতে হলে পড়তে হবে জলধর সেনের লেখা গল্প 'আরে অর্থাৎ'। ইস্কুল নিয়ে একগুচ্ছ গল্পের সংকলন 'ইস্কুলের গল্প' বইতে।

ইস্কুলের গল্প
শিশু সাহিত্য সংসদ, ৯০ টাকা
ছবিঃ ইন্টারনেট

পুরাণকথা: উড়ন্ত ক্যাঙ্গারু



কত্তো---দিন আগের কথা, সে আর মনে নেই; তবে পৃথিবী তখন কিছুদিন হল তৈরী হয়েছে। একদিন উঠল এক বিশাল ঝড়, জল-স্থলের উপর দিয়ে প্রচণ্ডবেগে ধেয়ে গেল। এতো রেগে ছিল ঝড়টা যে তার পথে যা কিছুই পড়ল, সব কিছুকেই নির্দয়ভাবে ধ্বংস করে দিল সে। কেউ কেউ বলল, এরা হল ঊনপঞ্চাশ পবনের ছেলেপুলের দল যারা সর্বদাই প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়; আবার কেউ বলল, না না, এ হল কুচুটে উত্তুরে হাওয়া, যারা সর্বদাই তাদের দক্ষিণী শান্ত তুতো-ভাইদের হিংসা করত, তাদেরই শক্তিপ্রদর্শনের নমুনা।

কিন্তু যে গল্পটাই ঠিক হোক না কেন, আসল ঘটনা হল অনেকদিন ধরেই ঝড়ের গর্জন চলতে লাগল; সকলেই খুব জ্বালাতন হচ্ছিল। তারা সাগরের জল ঝাঁকিয়ে বিরাট ফেনার চূড়ো তৈরী করে ফেলল, স্থলভূমিকে ঘেঁটে এমন বানাল যে বড় বড় গাছ থেকে শুরু করে ঘাস পর্যন্ত পথে শুয়ে পড়ল। যে সব গাছেরা নত হতে চাইছিল না, তাদের এই কঠোর ঝড় শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল। মানুষজন ঝড়ের প্রচণ্ডতায় ভীত হয়ে মাটির তলায় লুকাল আর এর পরেই যে শান্ত অবস্থা আসবে বলে তারা নিশ্চিত ছিল তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কেউ কেউ ছিল যারা নিজেদের তাদের বন্ধুদের থেকে চালাক মনে করত, তারা এই তাণ্ডবমুখর দৃশ্যগুলি বেশ উপভোগ করছিল। তাই তারা সমুদ্রের তীর বরাবর গুহাগুলিতে আশ্রয় নিল যাতে তারা প্রকৃতির এই হিংস্র লড়াই ভালভাবে দেখতে পারে।

এভাবেই আদিম অধিবাসীদের একটা দল যারা অস্ট্রেলিয়ার উত্তর সমুদ্রতীরের পাহাড়ে লুকিয়েছিল, তারা প্রথম ক্যাঙ্গারুর দর্শন পেলো। প্রথম দেখায় মনে হয়েছিল, এটাও বোধহয় উপড়ে পরা গাছপালারই আরেকটা টুকরো যেটা পাক খাওয়া জঞ্জালের সঙ্গে মেঘের মত তাদের তীরের দিকে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু একটা ব্যাপার এটাকে এই উড়ে আসা বস্তুগুলি থেকে আলাদা করেছিল। সবাই লক্ষ্য করল, জিনিষটা নড়ছে বটে তবে ঝড়ের খেয়ালখুশি মত নয়। এর বোধহয় প্রাণ আছে। সাহসী ছোট্ট প্রাণীটি মাটিতে পৌঁছানোর জন্য প্রাণপনে লড়াই করছে – এই ব্যাপারটা সেই দর্শকদের কাছে বেশ মজার মনে

হচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে যদিবা সে মাটিতে পা রাখে, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা দমকা হাওয়া তাকে আবার উড়িয়ে নিয়ে যায়।

যে লোকগুলি এতক্ষণ ধরে পুঁচকে প্রাণীটিকে পর্যবেক্ষণ করছিল, তাদের মনে হল প্রত্যেকবার প্রচণ্ড কষ্ট করে সে যেই মাটিতে পা রাখছে, অমনি যেন তার পা-টা একটু একটু করে লম্বা, আরো লম্বা হয়ে যাচ্ছে। যখন তারা প্রাণীটিকে আরো কাছে এবং আরো স্পষ্ট করে দেখতে পেল। তারা দেখল যে প্রাণীটি দেখতে কুৎসিত এবং জবুথবু মতন। এর মাথাটা ও সামনের পা'দুটো (যেটাকে ওর হাতও বলা যায়) ছোট, লম্বা একটা লেজ আছে, আর মনে হচ্ছে যেন পা-টা যতদূর পারা যায় টেনে টেনে চলছে। তবে দেখতে বিদ্ঘুটে আর ভালোবাসবার মত না হলেও একটা কথা সকলেই তারিফ না করে পারল না যে ছোট্টো প্রাণীটির যুঝবার শক্তি আছে বটে! এতো ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও সে কিছুতেই হার মানবে না।

অবশেষে সমস্ত দর্শকদের অনুচ্চারিত সেই ইচ্ছার জবাবেই যেন প্রাণীটির একটা পা বিরাট বিরাট পাথরের খাঁজে গজানো শক্তপোক্ত এক ঝোপের উপর আটকে গেল। ঝোড়ো বাতাস জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল, তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল, যেন শিকারকে সে কিছুতেই ছাড়বে না, ধরে রাখবেই। আর প্রাণীটিও তার শেষ উপায়কে কিছুতেই ছাড়বে না, এইভাবে নাছোড়বান্দার মত ঝোপটাকে আঁকড়ে রইল। শেষপর্যন্ত ঝড়ের ফোঁসফোসানি হার মানতে বাধ্য হল। শেষবারের মত গরগর করে প্রতিবাদ জানিয়ে ঝড়টা নিভে গেল। সমুদ্র আবার তার রোজকার জোয়ার-ভাঁটার ছন্দে ফিরে গেল। শুধু স্থলভূমি জেগে রইল এক বিধ্বংসী ঘটনার সাক্ষী হয়ে।

যে লোকেরা এতক্ষণ ধরে পাথরের আড়ালে বসে ঝড়ের তাণ্ডব দেখছিল, তারা এখন একে একে বের হল আর সবাই মিলে ঠিক করল, এই যে আজব প্রাণীটিকে নিয়ে ঝড় এতক্ষণ ধরে তাদেরই সমুদ্রতীরে গুলিডান্ডা খেলছিল, তার একটু খোঁজ নিতে হবে। কিন্তু প্রাণীটি এতক্ষণ ধরে ঝড়ের হাতে বন্দী হয়ে ছিল। এখন সে আর নিজের স্বাধীনতা খোয়াতে রাজী হলনা। যেই না মানুষরা তাকে ধরতে এলো, সে সামনের ঘাসেভরা সমতলের উপর দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তবে একটা কথা, সে কিন্তু তোমার আমার মত করে দৌড়ায় নি। ওইরকম একটা বিদ্ঘুটে বেঢপ শরীর নিয়ে সে এত দ্রুতগতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল যে মানুষের চোখ তো ছানাবড়া। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

তখন থেকে সবাই জানল যে ক্যাঙ্গারু হল অস্ট্রেলিয়ায় সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন। এহেন প্রাণীকেও আদিবাসীরা ধরে বন্দী করতে পেরেছিল, তবে সে অন্য আরেক গল্প।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উপকথা থেকে গৃহীত (Fairy Tales and Legends of the World, by Mae Broadley)

শুক্তি দত্ত
বৈষ্ণবঘাটা, কলকাতা

ছবিঃইন্টারনেট

স্বাধীনতার গল্প: পর্ব ৬



ওফ! পূজোয় কি আনন্দ! লেখাপড়ার বালাই নেই। টানা কত্তদিন ছুটি! তারপর আবার দুম করে স্কুল খুলে গেল। ব্যাস সব আনন্দের ইতি।আবার হাঁ করে সামনের বছরের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

যাক গে! আসল গল্পে ফিরি, যদি মনটা একটু ভালো হয়।

১৭৭০ সালে কিন্তু বাংলার বুকে কোনো ভুমিকম্প হয় নি।বৃটিশ কোম্পানির তহশিলদাররা কোনোরকম বিচার না করেই কৃষকদের শেষ সম্বলটুকু খাজনার নামে কেড়ে নিতে লাগল। ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের অর্থ আর বিলেতে শিল্পের রসদ জোগাতে গিয়ে বাংলার কৃষক নিঃস্ব হল। বাংলার বুকে শস্যহানির জেরে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ।বাংলার সন ১১৭৬ অনুসারে একে বলা হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এই দুর্ভিক্ষে ১ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়।ভাব তুমি, এই দুর্ভিক্ষ যে কোনো ভূমিকম্পের থেকেও ভয়ানক ছিল। আর বৃটিশরা ছিল পাথরের থেকেও হৃদয়হীন। যখন ১ কোটি মানুষ তাদের শোষণের জেরে প্রাণ হারাল, তখন বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তাদের কোম্পানির মালিকের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন যে, "দুর্ভিক্ষের ও মহামারীর জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হলেও রাজস্ব আদায়ে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি, বরং আগের চেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে।

কিন্তু এই মন্বন্তরও বাংলার মানুষের মনোবল ভেঙ্গে যায় নি; ইংরেজ অপশাসণ ও শোষণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল তারা অনেক আগে থেকেই।। তবে মন্বন্তরের সময় থেকেই তা বিদ্রোহের চেহারা নেয়। ইংরেজ-রা এর নাম দেয় সন্ন্যাসী বা ফকির বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের প্রথম সারির নেতারা হলেন মজনু শাহ, দেবী চৌধুরানী, মতি গিরি, মুশা শাহ, পরাগল শাহ প্রমুখ।প্রধান নেতা মজনু শাহ তাঁর সংগঠন ক্ষমতা ও বীরত্বে ইংরেজের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ান। বিহার থেকে বাংলার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত এই বিদ্রোহের আগুন সফল ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, বিদ্রোহীদের প্রচারে ও সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রভাবে।

মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীরা আলাদা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হলেও বিদ্রোহ পরিচালিত হত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেই। মজনু শাহ এক চিঠিতে রাণী ভাবানী-র কাছে প্রতিকারের দাবীতে সাহায্য প্রার্থনা করে লিখেছিলেন যে ইংরেজরা বিনা কারণে ১৫অ জন ফকিরকে হত্যা করেছে। এমনকি ইংরেজরা তাদের ধর্মস্থানে যেতে বাধা দেয়।

সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই জনবিদ্রোহ যা পরবর্তী শতাব্দীতে রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের আন্দোলনের জন্ম দেয়। ইতিহাস সাক্ষী, সব জায়গায় স্থানীয় গরীব জনসাধারণ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সাহায্য করেছে।১৭৬০-১৮০০ সাল পর্যন্ত এই বিদ্রোহের প্রসার।

পূর্ববংগ থেকে শুরু করে উত্তরবংগের রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর এমনকি নেপালের সীমান্তবর্তী তরাই পর্যন্ত বাংলা আর বিহারের বিস্তৃত ভূখন্ড জুড়ে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহীরা গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।কোথাও কোথাও দূর্গ নির্মাণ করে, অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করে মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতীর্ন হয়েছিল তারা।ঢাকা ও গোয়ালন্দে বজরা, ছিপ ও নৌকাতে জলযুদ্ধের মহড়া নিয়েছে তারা। দিনাজপুরের বালুরঘাটে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজবাহিনী পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়। রংপুরের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি এডওয়ার্ড নিহত হন ও তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়। গেরিলা যুদ্ধের সাহায্যে প্রথমে পিছিয়ে এলেও পরে দ্বিগুন শক্তিতে অতর্কিতে শত্রুর ওপর আক্রমণ চালিয়ে তারা বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে বহুবার। মজনু শাহের অনুগামীরা ঘাঁটি কলকাতার ইংরেজদের কুঠি অভিযানের প্রস্তাব দেন। মজনু শাহ অবশ্য তা চান নি।তিনি ইংরেজদের শক্তিক্ষয় ও বিব্রত করে চূড়ান্ত আক্রমনের পক্ষপাতি ছিলেন। কলকাতা আক্রান্ত হতে পারে এই ভয়ে ইংরেজরা বিরাট প্রস্তুতি নেয়। যশোরের কাছে মোগলহাট নামে এক জায়গায় বিদ্রোহীরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছে, তখনই অতর্কিতে ইংরেজ সেনাপতি লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে এক সুসজ্জিত বিশাল বাহিনী শেষরাত্রে আক্রমণ চালায়। মোগলহাটের যুদ্ধেই বিদ্রোহীদের চরম পর্যুদস্ত করে ইংরেজরা। এতে তাদের মনোবল বেশ আহত হয়।দুই ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহী নেতা নুরুল মহম্মদ ও পীতাম্বর এই যুদ্ধে নিহত হন। এরপর মজনু শাহ ইংরেজদের সাথে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাংলা ছেড়ে বিহারে আশ্রয় নেন।বিদ্রোহীদের সংগঠন অ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

পলাশীর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চল্লিশ বছর ব্যাপী সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ সফল হয় নি বটে, কিন্তু এটাই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের প্রথম সোপান। ইতিহাসের তাই এই সাহস নেই যে এই বিদ্রোহ কে শুধুমাত্র একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে এড়িয়ে যাবে।

আর্য চ্যাটার্জি
কলকাতা

বায়োস্কোপের বারোকথা: তারকাদের আবির্ভাব



(আগের সংখ্যার পর)

স্বাধীনতার পরে পরে, আরো একটা মস্ত ঘটনা ঘটে বানিজ্যিক ছবির, মানে যে ছবি আমরা হই হই করে দেখতে যাই, সেই দুনিয়ায়। আর তা হল যাঁদের তারকা বা স্টার বলা হয়, এমন একজন বা দুজনের আবির্ভাব। এইখানে, আমাদের একটু ভাবতে হবে, উত্তমকুমার কি করে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, এবং জীবনের শেষদিকে প্রায় নিজেই টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার জলছবি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া চৌধুরী, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও আরো পরের নায়িকাদের সঙ্গে তাঁর করা ছবি এখনও ঘরে ঘরে আলোচিত হয়। লোকের মুখে মুখে ফেরে এমন ছবির নাম হল 'হারানো সুর', 'সপ্তপদী', ' সাড়ে চুয়াত্তর', 'সাত পাকে বাঁধা'- এইসব।



উত্তমকুমার

উত্তমকুমার কেন এত বড় নক্ষত্র বা স্টার হয়ে উঠতে পারলেন? নিশ্চয়ই বড় অভিনেতা বলে, কিন্তু

সেটাই একমাত্র কারণ নয়। ছবি বিশ্বাস বা তুলসী চক্রবর্তীও তো খুব বড় অভিনেতা, কিন্তু তাঁরা তো আর 'স্টার' নন। উত্তমকুমার খুব আটপৌরে বাঙালির মত দেখতে ছিলেন। নায়কেরা যেরকম অসাধারণ সুন্দর হয় সেরকম কিছু নয়। আর সেখানেই তাঁর জোর। তাঁকে দেখলেই আমাদের পাশের বাড়ির ছেলে, দাদা অথবা খুব মাইডিয়ার কাকু মনে হয়। মনে হয়, জীবনের যে কোন ঝড়জলেই তিনি হটাত করে এসে আমাদের সমস্যার একটা সমাধান করে দেবেন, সে আমি ছবির নায়িকাই হই, অথবা ছোট কোন চরিত্রই হই। স্বাধীনতার পরে যখন বাঙালি জীবনে নানারকম বিচিত্র ও জটিল সমস্যা দেখা দিল, তখন উত্তমকুমারকে আমাদের প্রয়োজন ছিল। কারণ, তাঁর মুখ দেখলে মধ্যবিত্ত সমাজের হাজার হাজার মানুষের মনে হত, রাস্তায় যতই রোদ্দুর থাক, শরীরে যতই ঘাম ঝরুক, শেষ পর্যন্ত মুখে অমলিন হাসি নিয়ে উত্তমকুমার তো আছেনই। তাঁর অভিনীত গল্পে এই নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি ছিল। পন্ডিতেরা একে ক্যারিশ্মা (charisma) বলেন। আসলে পঞ্চাশের দশকে দেশ দুই টুকরো হয়ে যাওয়ায়, গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, তখনকার যুবক যুবতীদের জন্য যে ধরনের রূপকথার প্রয়োজন ছিল, উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন, রাজপুত্তুর ও রাজকন্যা হয়ে সেই প্রয়োজনের উত্তর দিতে পারতেন। এই জন্যই 'শাপমোচন' ছবিতে যখন গ্রামের ছেলে উত্তমকুমার শহরে এসে হেমন্ত মুখার্জীর গলায় গান গেয়ে একেবারে মাত করে দিলেন, তাঁর সেই জয়টাকে সেযুগের বাঙালী ছেলেমেয়েরা নিজেদের জয় বলে ভাবতে পেরেছিল। সুচিত্রা সেন ও প্রথম উত্তমকুমারের সাথে মিলে এখনকার বন্ধুত্ব ও মধুর সম্পর্কের বিষয়ে একটা ধারণা আমাদের দিয়েছিলেন।



সুচিত্রা সেন

আর কি ছিল যেই সোনার যুগ! উত্তমকুমারের গলায় গান গাইতেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও মান্না দে। মেয়েদের গলায় ছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, লতা মঙ্গেশকর, পরের দিকে আরতি মুখোপাধ্যায়। হাসাতেন তুলসী চক্রবর্তী তো বটেই, আর ভানু আর জহর তো এখন কিংবদন্তী হয়ে গেছেন। আর ছোটখাট চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করতেন, তাঁরাও সত্যি বড় অভিনেতা। এমনকি নামজাদা নায়ক ছাড়াও একটা ছবি সফল হয়ে যেত, যেমন 'পলাতক' - অনুপকুমার যার নায়ক, অথবা 'গল্প হলেও সত্যি' - দেখতে বেশ খারাপ রবি ঘোষ যার প্রধান চরিত্র। শুধুমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অথবা

মান্না দে'র গলার গুণে একেকটা ছবি সুপারহিট হয়ে গেছে, যেমন 'মনিহার', 'শেষ পর্যন্ত', 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'। সেই সময়ে টেলিভিশন ছিল না, পরিবারগুলিও এত ছোট ছোট ছিল না। সেইযুগে সিনেমা দেখতে যাওয়া ছিল একটা মুক্তি- যেমন ধর পরীক্ষার পরে সিনেমা দেখতে যাওয়া হত। তখন সিনেমা দেখা ছিল একটা উতসব, যেমন বাড়িতে নতুন জামাই এলে। এই যে সবাই মিলে হলে যাওয়া, ছবির শেষে কড়াইশুঁটির কচুরি আর নলেনগুড়ের সন্দেশ খেয়ে বাড়ি ফেরা, সেজদা সেলুনে উত্তমকুমারের মত ইউ ছাঁট চুল ছেঁটে বাড়িতে ফিরে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে কানমলা খাচ্ছে, অথবা ছোড়দি চুপিচুপি ছাদের কোণে প্র্যাকটিস করে নিচ্ছে -"মালতী মধুপে হল মিতালী..." সিনেমা ছিল এরকমই। মধ্যবিত্ত জীবনের জানালা দিয়ে দেখা এক টুকরো আকাশ...

হায়! সেই মায়াঝরা সন্ধ্যা!

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক
চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবিঃ উইকিপিডিয়া

ছবির খবর: টিনটিন – সিক্রেটস অফ দি ইউনিকর্ন



সারা পৃথিবীতে ২০১১ এর এগারোই নভেম্বর দিনটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন অনেক মানুষ – কারনটা সহজ,এমন তারিখ তো আর বারবার আসে না, প্রত্যেকেই তার জীবনের কিছু স্মরনীয় মুহুর্ত পালন করতে চাইছিলেন এই দিনটাতে। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে দুনিয়ার কচি কাঁচারাও এই দিনটার দিকে তাকিয়ে ছিল বিশেষ কারনে – টিনটিন আসছে যে বড় পর্দায়, তাও আবার ত্রিমাত্রিক ছবিতে অর্থাৎ টিনটিন কেবল সিনেমার পর্দায় ঘুরে বেড়াবে না, তাকে চলতে ফিরতে দেখা যাবে একেবারে সামনে থেকে – যেন জলজ্যান্ত টিনটিন গপ্পের বই থেকে এসে গেছে নাকের ডগায়। আবার টিনটিন যে শুধু খুদে দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় এমন তো নয়, আজকের দিনে বৃদ্ধরাও তাঁদের শৈশবে টিনটিনকে নিয়ে মাতামাতি করেছেন। তার ওপরে এই সিনেমা তৈরী করেছেন স্টিভেন স্পিলবার্গের মত বিশ্বপ্রসিদ্ধ পরিচালক। কাজেই তিনি যখন টিনটিনের মত ঐতিহাসিক কার্টুন চরিত্র নিয়ে সিনেমা করছেন আর সে সিনেমা যখন মোশন ক্যাপচার টেকনোলজি দিয়ে তৈরী (অর্থাৎ অভিনেতাদের দিয়ে ছবির শুটিং করে তা ডিজিটাল মডেলের মধ্যে রূপান্তরিত করা), তখন সে সিনেমার ওপর প্রত্যাশা যে আর পাঁচটা অ্যানিমেশন ফিল্মের চেয়ে অনেক বেড়ে আকাশছোঁয়া হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

গল্পটা একটু দেখা যাক। টিনটিন একদিন বাজারে ঘুরতে ঘুরতে কিনে ফেলে সপ্তদশ শতাব্দীর একটি জাহাজের মডেল, যার নাম ছিল ইউনিকর্ন। শাখারিন নামের এক ভদ্রলোক টিনটিনের কাছ থেকে জাহাজটি কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু টিনটিন রাজী না হওয়ার পর আকস্মিকভাবে সেটি চুরি

যায়। এদিকে শহরে এক পকেটমারের উপদ্রবে সকলে অস্থির হয়ে উঠলে যমজ গোয়েন্দা জনসন আর রনসন তদন্তে নামে। এর মধ্যে টিনটিন বন্দী হয় কারাবুজান নামের একটি জাহাজে – যেখানে জাহাজের ক্যাপ্টেন আর্চিবল্ড হ্যাডককে নেশাগ্রস্ত করে রেখে শাখারিন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা এক গভীর ষড়যন্ত্র করছেন। টিনটিনের আলাপ হয় ক্যাপ্টেন হ্যাডকের সাথে এবং সে পালায়। এরপর আস্তে আস্তে রহস্যের জাল একটু একটু করে পরিষ্কার হতে থাকে। ক্যাপ্টেন হ্যাডকের পূর্বপুরুষ স্যার ফ্রান্সিস হ্যাডক ইউনিকর্ন নামের একটি জাহাজে করে অতুল বৈভব নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করার সময় রেড র‍্যাকহ্যাম নামের এক কুখ্যাত জলদস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হন। জলদস্যুরা প্রতারনা করে জাহাজের সম্পদ দখল করার চেষ্টা করলে তিনি জাহাজে বিস্ফোরন ঘটিয়ে সেটিকে ডুবিয়ে দেন, তলোয়ারের লড়াইয়ে মেরে ফেলেন রেড র‍্যাকহ্যামকে। তিনি সেই অভাবনীয় সম্পদের কিছু অংশ সামলাতে পেরেছিলেন, এবং সেটাই গুপ্তধনের আকারে রেখে গেছেন আর সেই গুপ্তধনের সঙ্কেত লুকিয়ে রেখে গেছেন তিনটি ইউনিকর্ন জাহাজের মডেলের মাস্তুলে। অবশেষে টিনটিনের সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির কাছে হার মানে শাখারিন, আর ক্যাপ্টেন হ্যাডক পেয়ে যান তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গুপ্তধন।

গল্পটা ঠিক অক্ষরে অক্ষরে সিক্রেটস অফ ইউনিকর্ন বইয়ের মত নয় তবে অনেকেরই জানা – কারন তিনটি আলাদা গল্পের কিছু কিছু অংশ জুড়ে তৈরী হয়েছে সিনেমার গল্প। বই না পড়ে সিনেমা দেখলে ক্ষতি নেই, কিন্তু যারা কিনা টিনটিনের বইয়ের পোকা তারা তো মেলাতে যাবেই প্রতিটি চরিত্র, তাদের খুঁটিনাটি, তাদের মুখের বুলি, পোষাক সবকিছু - আর সেখানেই স্পিলবার্গের টিনটিন কোথাও যেন হার্জের টিনটিনের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। ক্যাপ্টেন হ্যাডক যেন সেই ক্যাপ্টেন হ্যাডক নন যিনি চেঁচিয়ে উঠবেন বস্তাপচা গেঁড়ি গুগলির ঝাঁক বলে। যে জনসন রনসনকে আমরা চিনি, সিনেমার পর্দায় তাঁরা একটু অন্যরকম। টিনটিন অনেকটা নিখুঁত হলেও, এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে টিনটিনের গল্পের মূল আকর্ষন কিন্তু কেবল সে নিজে নয় - অনেকটাই দাঁড় করিয়েছেন পার্শ্বচরিত্ররা। আর সেখানেই যেন একটু অতৃপ্তির স্বাদ থেকে গেল। তবে সিনেমাটি নিজের জায়গায় স্বতন্ত্র। আর সত্যজিত রায়ও গুপি বাঘার সিনেমা গল্প মেনে করেননি। চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে তাকে বদলেছেন নিজের মত। কাজের কথা এইটাই যে স্পিলবার্গ আরো দুটি টিনটিনের সিনেমা নিয়ে চুক্তিবদ্ধ, বইয়ের পাতায় যে টিনটিনকে দেখেছি তাকে পর্দায় আরো বেশি করে পাওয়া যাবে এটা কে না চাইবে। তাই না?

অভ্র পাল
কলকাতা

ছবিঃ উইকিপিডিয়া

দেশে-বিদেশে

অ-পূর্ব সিকিম

"বুড়ো হাড়ে, পাহাড়ে!"যদিও হাড় এখনও সবারই শক্ত-পোক্ত, তাও, স্লোগানের মতন দেবাঞ্জনের মুখের কথাটা দিয়েই যাত্রা শুরু। স্কুল-কলেজের সেই উদ্দামতা তো আর নেই, সেই তুলনামুলক ভাবে বলাই যেতে পারে – "বুড়ো-হাড়!"উষ্ণীষের মেয়ে হয়েছে এক বছর হল। ছোট্ট "গিনি"-কে ফেলে বেরোয়েনি ও কোনোদিন। তাও, মেয়েকে মা'র কাছে রেখে বাবা পালালেন স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে। ১লা ডিসেম্বর, ২০১১। আমি, দেবাঞ্জন আর উষ্ণীষ। তিনে মিলে স্কুলের দিন গুলো রোমন্থণ করতে করতে বেরিয়ে পড়লাম সিকিমের উদ্দেশ্যে।সিকিম – আমার অতি প্রিয়, অন্তরের খুব কাছাকাছি এক জায়গা। কত বার যে ফিরে ফিরে এসেছি এখানে। এক এক সময়ে এক এক রূপে দেখেছি, তবু মন ভরেনি। বলেছি আবার আসব, এসেওছি। এই বছরেই এই নিয়ে আমার দ্বিতীয়বার আসা। তবে এবারে যেখানে যাচ্ছি সেখানে এই প্রথমবার।২রা ডিসেম্বরনিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস পৌঁছল সোয়া সাতটায়। নেমেই চোখ সার্থক করলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শনে। ঝকঝকে আকাশ। মন ভাল হয়ে গেল। শিলিগুড়িতে এসে একটা হোটেলে চট-জলদি তৈরী হয়েই বেরিয়ে পড়া রংপো-র দিকে। তেঙ্গিং-নোরগে বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উলটো দিকেই সারি সারি গ্যাংটকের শেয়ার জীপ দাঁড়িয়ে। দরদাম করে একটা টাটা ভিক্টা বুক করে বেরিয়ে পড়লাম তিন জনে। টোটকা : বলে রাখি, পাহাড়ি রাস্তায়ে চলার আগে অল্প কিছু খাওয়া আর সঙ্গে কোল্ড-ড্রিঙ্কসের একটা বোতল রাখা ভাল। পেট খালি থাকলে বা বেশী ভর্তি থাকলে অসুবিধে হয় অনভ্যস্তদের। আর কোল্ড-ড্রিঙ্কস পাহাড়ি রাস্তায় বমি ভাব কমায়ে।গাড়ি চলল মহানন্দা অভয়ারণ্যের বুক চিরে। খানিক বাদেই সঙ্গী হল তিস্তা। তার সঙ্গে এঁকে-বেঁকে পথ চলা। রাস্তার অবস্থা কিছু জায়গায়ে খুব খারাপ। তাই সেবক, তিস্তাবাজার, মেল্লি হয়ে রংপো পৌঁছোতে আমাদের একটা বাজল। এখান থেকে আমাদের অন্য গাড়ি ঠিক করা ছিল। সোম তামাং আমাদের পথ-প্রদর্শক, বাহনচালক। সে রংপো-র বড় পেট্রোল পাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল নিজের বোলেরো গাড়ি নিয়ে। জুলুক থেকে সক্কাল-সক্কাল বেরিয়ে সে এসেছে আমাদের নিতে। জুলুক - পূর্ব সিকিমের অভ্যন্তরে এক ছোট্ট গ্রাম। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে, এবং গোপাল প্রধান নামক এক জুলুক-বাসীর তাগিদে, জায়গাটা কিঞ্চিত পরিচিতি পেয়েছে। এই গোপাল প্রধানই জুলুক-কে বিশ্বের সামনে এনেছিলেন "হোম স্টে" শুরু করে। এখন ওনাকে ওই দিককার লোকেরা সবাই এক নামে চেনে। রংলি সময় কম। তাই গাড়ি চলল চটজলদি রংলি-র দিকে। রংপো ছাড়াতেই রাস্তা খুব খারাপ, কিন্তু চারিদিকের দৃশ্য খুব সুন্দর হয়ে উঠলো। অপরুপা রংপো-চু নদী আমাদের সঙ্গী। তার পাশ ধরে রোরাথাং পেরিয়ে রংলি পৌঁছে গেলাম দেড় ঘন্টারও আগে। তিনটের মধ্যে না পৌঁছলে এখানকার পারমিট অফিস বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আর হাজার চেষ্টা করলেও কেউ নিয়ে যাবে না জুলুক। রংপো ফিরে যেতে হবে সেদিন। আবার পরের দিন শুরু করতে হবে যাত্রা।রংলি-র পরেই রাস্তা ঘুরপাক খেতে খেতে ওপরে উঠতে থাকল। একজন আর্মি অফিসার আমাদের গাড়িতেই উঠে বসলেন; তাঁকে জুলুক যেতে হবে সেদিনই। সিকিমে তার তিন বছরের পোস্টিং ছিল, আর কদিন পরেই ট্রান্সফার হবেন রাজস্থানে। পদমচেন ছাড়িয়ে জুলুক পৌঁছলাম যখন, তখন অন্ধকার নেমে গেছে। পদমচেনে সূর্যাস্ত প্রচন্ড ঠান্ডা লাগছে গাড়ি থেকে নেমেই। ঠক্‌ঠক্ করতে করতে হোটেলের রুমে ঢুকলাম। জল বরফের থেকেও বুঝি ঠান্ডা! পুষ্পা নামের একটা ছেলে গরম চা এনে দিল, খেয়ে একটু তৃপ্তি পেলাম সবাই। আসতে আসতে সয়ে এল শীত। রাতটা যা হোক করে কাটিয়ে দিলাম জুলুকের

অন্ধকার পাহাড়ের মধ্যে।৩রা ডিসেম্বরসকাল হল, কিন্তু সূর্য উঠল না আকাশে। অভ্যাসবসত, আমাদের আসার খবর আগাম পেয়ে গিয়ে পৃথিবীর সব মেঘ একত্রিত হল জুলুকে। জুলুক থেকে সবাই এক অবিস্মরণীয় সুর্যোদয় দেখতে যায় কিছুদুরের "সানরাইজ পয়েন্ট"-এ। কিন্তু এই সকালটা সবাই আরাম করে ঘুমোলো লেপের তলায়। সকাল ৯টার পর থেকে তো দশ হাত দুরের জিনিস আর দেখা যাচ্ছে না, এত মেঘ আর কুয়াশা। আমরা ধীরে সুস্থে সাড়ে দশটার সময় বেরোলামজুলুক ছাড়িয়ে কুপুপ-এর পথে। ভাবলাম যদি খানিক পরে আরও উচ্চতায় উঠলে একটু পরিস্কার আকাশ পাওয়া যাবে। হল তার উলটো। জুলুক ছাড়াতেই বিখ্যাত "বত্তিস মোড়"। পরপর ৩২টা হেয়ারপিন বেন্ড রয়েছে প্রায় ১২কি,মি রাস্তা ধরে। এবং এখানকার সব থেকে অনন্য দৃশ্য হল যে এই ৩২ মোড়ের পরে পুরো রাস্তাটা এক সঙ্গে দেখা যায়ে পাহাড়ের গা বেয়ে কেমন এঁকে বেঁকে উঠে এসেছে। আমাদের অবস্থা একদম অন্যরকম। আমি সোম তামাং-এর পাশে বসা অবস্থায় রাস্তার দিকে তাকাচ্ছি আর ভাবছি, সোম গাড়িটা কি দেখে চালাচ্ছে? কিচ্ছু তো দেখাই যাচ্ছে না সামনে!!! শুধু মেঘের রাজ্য। ওই ৩২টা হেয়ারপিন বেন্ড তথা সেদিনের বাকি রাস্তাটাও যে কি ভাবে কি দেখে সোম গাড়ি চালাল ওই জানে! আমার কাছে অপার বিস্ময়! খানিক বাদে রাস্তায় বেশ কিছু লোকজনের দেখা পাওয়া গেল। ওরা রাস্তা সারানোর কাজ করে। সকাল থেকে এসেছে, তখন খাবার বানাচ্ছে রাস্তার পাশেই। সবার মুখেই হাসি, ছবি তুললে তাদের কোনো দ্বিধা নেই। রাস্তার আশেপাশে বরফ দেখতে পাচ্ছি ছাড়া-ছাড়া। তখন তাপমাত্রা শূন্যের নীচে, আর আমরা গাড়ি থেকে নেমে জড়ভরত হয়ে গেছি। বিনা পয়সায় ওরা আমাদের চা খাওয়ালো। তারপরে গাড়ি চলল বটে কিন্তু আমরা কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিলাম না মেঘের জন্যে। রাস্তা উঠেই চলেছে, কিন্তু রাস্তার অবস্থা ভাল মিলিটারিদের যাতায়াত বেশি বলে। আদি বাবা মন্দির পৌঁছলাম আরও এক ঘন্টার মধ্যে। চারিদিকে সাদা বরফ, সাদা মেঘ। উচ্চতা ১৪,০০০ ফিট মতন হবে। এই বাবা কোনও হিন্দু ভগবান নন। ইনি খাঁটি মিলিটারির লোক ছিলেন। বহু প্রচলিত হলেও বলে রাখি, (বাবা) হরভজন সিং ২৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট-এ ছিলেন। একদিন টুকুলা থেকে ডেংচুক লা যাবার পথে তিনি পা ফসকে নদীর জলে পড়ে স্রোতে ভেসে মারা যান। একদিন কারুর স্বপ্নে এসে তিনি দেখা দিয়ে বলেন তাঁর সমাধি-র ব্যবস্থা করতে। সেই সমাধিই আজকের এই আদি বাবা মন্দির। বাবা মন্দিরে ভক্তদের জন্যে প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। গরম গরম চা ফিল্টারে রাখা রয়েছে, যে খাবে পাশে রাখা গেলাশে করে ফিল্টার থেকে ঢেলে নিলেই হল। তারপর গেলাশ ধুয়ে রেখে দিতে হবে যথাস্থানে, শুধু এইটুকুই শর্ত।বাবা মন্দিরে প্রণাম ঠুকে এগোলাম, কিছুটা এগোতেই টুকলা ভ্যালি-তে (১৪,৫০০ ফিট) পৌঁছলাম। এখানে শুধু রাস্তাটাই বরফ বর্জিত, বাকি সর্বত্র পুরু বরফে ঢাকা। আরও ১৩ কিমি দূরে কুপুপ। কিন্তু বুঝলাম কিছুই দেখা যাবে না। তাই টুকলা ভ্যালিতে বরফ ছোঁড়াছুঁড়ি করে থাখাং-এর দিকে চললাম, যেখানে আমাদের রাত্রিবাসের বুকিং।টুকলা থেকে থাখাং-এর রাস্তা খুব কঠিন উৎরাই। তাই ওই রাস্তায় শুধু মিলিটারি গাড়ি ছাড়া কিছু উঠতে পারে না, শুধু সাবধানে নামা সম্ভব। রাস্তায় বেশ কিছু মহিলা আমাদের গাড়িতে চড়ে বসলেন। তারা কাজে এসেছিলেন এদিকে, আবার নেমে যাবেন জুলুক-এ। সেই জনা ছয়েক মধ্যবয়স্ক-স্বল্পবয়স্ক মহিলাদের সঙ্গে আঁটোসাঁটো হয়ে বসে থাখাং অবধি এলাম। তখন মাত্র সাড়ে বারোটা বাজে। কাঠের গোটা পঞ্চাশ বাড়ি নিয়ে ছোটো এক জনপদ এই থাখাং। এখানে এত শীত, যে আমাদের গাড়ি এখানে রাখা যাবে না। সারারাচ থাকলে পরের দিন আর চালুই হবে না গাড়ি। তাই মালপত্র নামিয়ে, বাকি মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে সোম তামাং আমাদের ডিপ্-ফ্রিজে মাছ রাখার মতন থাখাং-এ রেখে ফিরে গেল জুলুক। থাখাং দফতর বাংলো আমরা তিনজন একটা ১৯২০ সালে তৈরী "দফতর বাংলো"-র সামনে কঙ্কালের মতন

দাঁড়িয়ে, এমন সময়ে ভেতর থেকে এক সুন্দরী তন্বী এসে সিকিমি টানে কিন্তু স্পষ্ট ইংরেজিতে বলল, "You are from Calcutta? Mr. Banerjee? Please come inside." আমরা খানিক নিজেদের মুখের দিকে চেয়ে মালপত্র হাতে করে বরফ মাড়িয়ে ভেতরে গেলাম। ইংরেজরা এখানেও এসে ঘাঁটি গেড়েছিল ভেবে অবাক লাগছিল। বাংলোটি ১৯২০ সালে তৈরী হলেও, এটি সাম্প্রতিককালে সিকিম সরকার জীর্ণসংস্কারন করেছে, তাই এখন ঝাঁ-চকচকে। তিনটে ঘর। দুপাশের দু-টো রুমে অ্যাটাচ্‌ড টয়লেট, মাঝের টায়ে নেই। এত উঁচুতে এত সুদূরে এত ভাল থাকার ব্যবস্থা আভাবনীয়। ঘরে 'ফায়ার প্লেস'-এর বন্দোবস্তও আছে। বাংলো-র লাগোয়া কিচেন কাম ডাইনিং হল, ওরফে একটা ছোটো পৃথক ঘর। সেখানে গেলাম, আর সেই পাহাড়ি যুবতির হাতের গরম ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দিয়ে মনে হল স্বর্গে এসে অমৃতপান। ক্লান্তি ও শীত দুই কমলো। মেয়েটির নাম পেমা শেরপা। দফতর বাংলো এই বছরের মে মাস থেকে ট্যুরিস্টদের জন্যে খোলা হয়েছে এবং পেমা এখানকার সম্পূর্ণ দ্বায়িত্ব নিয়েছে। ট্যুরিস্টদের আপ্যায়ন করা, দুপুরের খাবার বানানো, চা - গরম জলের বায়না সামলানো, ফায়ার প্লেসে আগুন ধরানো, সন্ধ্যের পাকোড়া ভাজা, রাতের খাবার বানানো, কম্বলে সেঁধিয়ে দেওয়া ট্যুরিস্টদের সান্ধ্য আড্ডা থেকে ডেকে তুলে খেতে দাওয়া, এবং রাতে অতিরিক্ত কম্বলের যোগান দেওয়া অবধি সব কাজ নিজেই করে মেয়েটা। শুধু ফায়ার প্লেসে কাঠটা বোধ-হয় অন্য কেউ এনে দিয়েছিল। শিক্ষিত মেয়ে, রংপো-রংলিতে পড়াশুনা করেছে কলেজ অবধি, তারপর কল-সেন্টারের ট্রেনিং করেছিল। গাথাং বাংলো না হলে হয়ত পেমা এখানে থাকতও না। কিন্তু এখানেই সে ভাল আছে। নিজের বাড়িতে থেকে কাজ পাশের হোটেলে, ক্ষতি কোথায়? পেমা শেরপা শেষ দুপুরে বরফ পড়তে শুরু করল। প্রথমে মিহি, তারপরে ঝিরিঝিরি, তারও পরে বেশ জোরে। ১৪ই নভেম্বরের পরে এই ৩রা ডিসেম্বরে প্রথম বরফ পড়ল। এর মধ্যে আকাশ একদম পরিস্কার ছিল। কিন্তু ঠান্ডা বেশী বলে অনেক জায়গাতেই বরফ গলতে পারেনি। এখন আবার সেই পুরনো বরফের ওপর নতুন সাদা বরফ জমতে শুরু করল। রাস্তা, বাড়ির চাল, গাছের ডাল, সব ঝুরো বরফে ঢাকতে শুরু করল। দুপুরের খাবার খেয়ে দেবাঞ্জন তো ঘুম দিয়েছিল। ওকে আমি আর ঊষ্ণীষ ডাকলাম বরফ পড়া দেখবার জন্যে। ও আলসেমি ছেড়ে উঠতে পারল না আর ওই ঠান্ডায়। জানলা দিয়ে একটু বাইরে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "আরেকটু জোরে পড়লে আমাকে ডাকিস!" ঊষ্ণীষও একটু বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়ল, আর আমি বেরোলাম ক্যামেরা হাতে গাথাং-এর ঘুমন্তপুরীর ছবি তুলতে। ঘুমন্তপুরী গাথাং গাথাং-এ বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বিদের একত্রিত বাস। এখানে যেমন কৃষ্ণ মন্দিরও আছে, সেরকম বৌদ্ধ গুম্ফাও রয়েছে। এখানে শেরপা-তামাং-ভুটিয়া এবং রাই-ছেত্রি-প্রধান সবাই একত্রে বসবাস করে। আর আছে মিলিটারি লোকেরা। গাথাং একটা উপত্যকা। চারদিকে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল হিমালয়ের তুষার-মেরুর হাত থেকে কিছুটা রক্ষা করে। এখানে ইয়াক চরে বেড়ায়ে নিজের মনে। ফাঁকা রাস্তায়ে একা ঘুরে বেড়াতে দেখলে বেঁটে বেঁটে কুকুর গুলো ঘেউ ঘেউ করে। কাঠের বাড়ির সামনের দরজা এখানে মাটি থেকে কোমর অবধি, ওপরের বাকিটা ফাঁকা - এর কারণ আমার জানা হয়নি। আমি মনাস্টরিতে গেলাম, তবে বেশীক্ষন থাকলাম না। অন্ধকার প্রায়ে বিকেলে সেখানে প্রাণ-বর্জিত। গাথাং ভ্যালিতে তখন ক্রমাগত বরফ-পাতের জন্যে প্রচন্ড কুয়াশার ব্যাপারটা কিছুটা পরিস্কার হয়েছে। দেখতে পাচ্ছিলাম গ্রামটাকে ঘিরে রেখেছে বরফাবৃত পাহাড়। একটা সরু লোহার সাঁকো পেরিয়ে যাওয়া যায় কৃষ্ণ মন্দিরের দিকে। কিছুটা এগোনোর পরে দেখলাম বাড়ি ঘর শেষ, সামনে খালি মাঠ, অন্ধকার হয়ে আসছে, আর মেঘের জন্যে ভাল দেখাও যাচ্ছে না কোন দিকে মন্দির। তার চেয়ে বাংলোয়ে ফিরে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে হল। গাথাং বাংলোয়ে এসে বাকিদের কুঁড়ে হয়ে শুয়ে থাকার জন্যে গালাগালি দিলাম বটে কিন্তু গরম গরম পাকোড়া আর

ব্ল্যাক কফি খেয়ে কম্বলের তলায়ে ঢুকেই কাঁপুনি শুরু হল। তখন বুঝলাম দেবাঞ্জন কেন শুয়ে পড়ার পর আর উঠতে পারেনি। রাতে খেতে যাওয়াটা মনে হচ্ছিল অনেক জন্মের পাপের শাস্তি! দুপুর ১২টার সময় যে জায়গায়ে -৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা থাকে, সেখানে রাত ৯টায়ে যে কি অবস্থা তা ভেবেই মনে হচ্ছিল উপোস করা এর চেয়ে ঢের ভাল! তবে খাবার জুটল দারুন। গরম গরম ডাল ভাত মাংস খেয়ে বেশ চাঙ্গা লাগল শরীর। দফতর বাংলো-র পেছন দিকে দাঁড়িয়ে গাথাং উপত্যকা চাঁদের আলো ছাড়াই বেশ দেখা যাচ্ছিল বরফের আভায়। ৪ঠা ডিসেম্বরখুব সকালে উঠে লাভ ছিল না কারন আকাশের মেঘ কাটেনি। তাই ৭টা অবধি শুয়েই থাকলাম। সোম তামাং কে বলা ছিল যদি আকাশ পরিস্কার থাকে, তাহলে যেন ভোরের দিকেই চলে আসে গাথাং-এ। এল না দেখে বুঝলাম সর্বত্রই একই অবস্থা। পেমা আমাদের এক প্রস্থ চা দিয়ে জলখাবারের ব্যবস্থা করতে লাগল। তার মধ্যে মধ্যে আরও চা-এর বায়না যখনই করেছি তখনই পেয়েছি। পেমা শেরপার আতিথেয়তায়ে কোনো খুঁত নেই। গল্প করতে করতে তৈরী হয়ে গেলাম সাড়ে আট্টার মধ্যে। সোম এসে গেল ওই সময়েই। আমরা আবার মালপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বরফাবৃত গাথাং ছাড়িয়ে কুপুপ-এর উদ্দেশ্যে। সোম তামাং আগের দিনের থেকে অনেকটাই পরিস্কার আবহাওয়া। যদিও আকাশে নীলের চিহ্ন কোথাও নেই। গাড়ি আবার ঘুরে এসে পৌঁছোলো আদি বাবা মন্দিরের সামনে। আগের দিনের বরফ পড়ার ফলাফল চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। আগের দিন দেখেছিলাম রাস্তার দুধারে বরফ, আর এইদিন দেখলাম রাস্তার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই, পুরোটাই সাদা। তার ওপর দিয়েই ভ্রুক্ষেপহীন ভাবে সোম তামাং গাড়ি চালাচ্ছে আর মাঝে মাঝে বলছে "টায়ার স্কিড় কর রাহা হ্যায়"। আমি চুপচাপ ভিডিও ক্যামেরা চালু রেখে বসে আছি। টুকলা ভ্যালী-র পর থেকে গাড়ি আবার নিম্ন-গামী। এক সময় হাতি লেক-এ পৌঁছলাম। দারুন সুন্দর লেক, রাস্তা থেকেই দেখতে হয়, পাহাড়ের ধাপ বেয়ে কাছে যাবার ছাড়পত্র নেই। মিলিটারির এলাকা, কোনো ব্যতিক্রম হবে না নিয়মের। দেখলাম একশোর ওপর "রেড বিল্ড়চাফ" উড়ে যাচ্ছে লেকের ওপর দিয়ে। ওখানকার লোকেরা বলে "চাইনিজ কাউআ"। কুচকুচে কালো শরীরে লাল ঠোঁট। হাতি লেক আর ১ কিমি যেতেই কুপুপ গ্রামে পৌঁছোলাম। পুলিশ চেকপোস্টের পাশে একটা বোর্ডের গায়ে লেখা ১৩,৯০০ ফিট। কয়েকটা দানবাকৃতির ঘোড়া নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোটা কয়েক ঘর নিয়ে এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। লোকজন বিশেষ কেউ নেই রাস্তায়। কিছু বাড়ির অ্যাসবেস্টসের ছাত থেকে চুঁইয়ে পড়া জল ঠান্ডায় বরফে পরিনত হয়েছিল, দেখলাম সেগুলো গলতে শুরু করেছে। বুঝলাম, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রাও শূণ্যের গন্ডি ছাড়িয়ে বাড়তে শুরু করেছে। কুপুপ উপত্যকা একটা দোকানে ঢুকে কফি খেলাম। দেবাঞ্জন একটা চাইনিজ কম্বল কিনে ফেলল ৮০০ টাকা দিয়ে। এখানে এবং আসে পাশে চায়নার লোকেরা এসে মার্কেট বসায় জুলাই থেকে নভেম্বর। তখন সেই মার্কেট থেকে জিনিস পত্র কিনলে এই ৮০০ টাকার চাদর হয়ত ৪০০ টাকেতেও পাওয়া যেতে পারে। আপাতত এবারের যাত্রা আমাদের এই কুপুপ অবধি। আর ৫৮ কিমি দূরে গ্যাংটক শহর। সেই রাস্তা গেছে আমাদের পরিচিত ছাঙ্গু লেকের পাশ দিয়ে। আমাদের সেই দিকে যাবার ছাড়পত্র বানানো নেই। তাই আমরা অপূর্ব এই কুপুপ উপত্যকার ছবি ক্যামেরা বন্দি করে ফিরে চললাম। বরফের মোড়কে ঢাকা রইল পূর্ব সিকিমের সু-উচ্চ হিমালায়ের গহন অন্তর। চলার পথে ক্রমশ হারিয়ে গেল বরফের শুভ্রতা, গাছপালা বাড়তে শুরু করল, ৩২ মোড় পেরিয়ে নেমে এলাম জুলুকে। জুলুকের এক শিশু তখন বেলা সাড়ে বারোটা। সামান্য চায়ের বিরতি, আবার পথ চলা। রংলি-র একটু পরে রোড়াথাং-এর ব্রীজের ওপর দিয়ে রংপো-চু পেরিয়ে রংপো-র দিকের রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরলাম। রেণক হয়ে রেশীতে পৌছে আমরা সিকিমের সীমান্ত পেরিয়ে গেলাম। রেশী শুনেছিলাম খুব

সুন্দর জায়গা, কিন্তু ওই অপার্থিব পাথাং-এর স্মৃতি এই জায়গার সৌন্দর্যকে খর্ব করে দিচ্ছে মনে হল। পরে কোনো একদিন মস্তিস্ক-প্রক্ষালক যন্ত্র দিয়ে মাথা পরিস্কার করে এখানে এসে এখানকার আঘ্রাণ নিতে হবে।এর পরে আমরা সিকিমের সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আরও কিছু দ্রষ্টব্য জায়াগায়ে ঘুরেছিলাম। তবে সে গল্প না হয় এখন তোলা থাকল।৬ই ডিসেম্বরনিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে এসে ট্রেন ধরার আগে একবার সব মালপত্র মিলিয়ে নেওয়া হল যে সব কিছু ঠিক ঠাক নিয়ে আসা হয়েছে কিনা। খাবার কিনে নিলাম ষ্টেশন থেকেই। ট্রেন ছাড়ল। হটাৎ দেবাঞ্জন সার্টের পকেট প্যান্টের পকেট হাতড়াতে লাগল! চমকে গিয়ে বললাম, “কিছু ফেলে এলি নাকি?”দেবাঞ্জন খোঁজা থামিয়ে হেসে বলল, “মন-টা খুঁজছি। পাচ্ছি না। মনে হয়, সিকিমেই ফেলে এসেছি!”

লেখা ও ছবিঃঋতম ব্যানার্জিকলকাতা

মিসৌলাতে কয়েকদিন

এই সময়ে একের পর এক বড়দিনের ছুটি, নতুন বছরের ছুটি। বাইরে উত্তরের কনকনে ঠান্ডা হাওয়া, ভোরের কুয়াশা, চামড়ায় টান ধরার অস্বস্তি, নলেন গুড়ের সন্দেশ, বড়দিনের কেক - সবকিছু মিলিয়ে একটা ছুটির আমেজ। এর মধ্যেই যদি ২/৩ দিনের ছুটিতে যদি কোথাও ঘুরে আসতে পার বা বন্ধুবান্ধব আর বাড়ির লোকেদের সাথে কোথাও একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করে ফেলতে পার, তাহলে তো শীতের ছুটির একদম ষোলকলা পূর্ণ। এইরকম একটা ফুরফুরে মেজাজে আজ তোমাকে আমার কিছুদিন আগের একটা ভীষণ মজার বেড়াতে যাওয়ার গল্প বলি।

গল্পটা শুরু করার আগে যে বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম তাদের একটা ভূমিকা দেওয়া দরকার। গত আগষ্ট মাসের মাঝমাঝি - এক বন্ধুর সাথে একটা গানের কনসার্টে গিয়েছিলাম। সেখানে গানবাজনা শুনতে শুনতেই আলাপ হল মন্টানা থেকে আসা আর কয়েকজনের সাথে - এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কার্ক আর ক্যারোলিন। এদের কথাই পরে আবার বলব। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার মধ্যেই এই মানুষগুলোর দরাজ মন আর মিশুকে স্বভাবের জন্য খুব ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেল - মনে হচ্ছিল যেন এদের সাথে বহু বছরের আলাপ আর বন্ধুত্ব। কিন্তু আফসোসের কথা হল, অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমার এই নতুন বন্ধুদের টেলিফোন নাম্বার বা ই-মেইল রাখতেই ভুলে গেলাম। তাই বাড়ি এসে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। যাই হোক, ছুটি কাটিয়ে আবার গতানুগতিক জীবনের সাথে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছি। দু'তিন দিন পর অফিসের কাজের ফাঁকে ই-মেইল দেখতে গিয়ে হঠাৎ দেখি ক্যারোলিনের ই-মেইল। আগের খারাপ করা মনটা এক ধাক্কায় অনেকটা ভাল হয়ে গেল। কার্ক আর ক্যারোলিন নাকি দু' দিন ধরে ইন্টারনেটে আমার নাম দিয়ে খুঁজে খুঁজে আমার ই-মেইল বের করেছে। এরপর বেশ কয়েকবার ই-মেইল আদানপ্রদানের মধ্যেই ক্যারোলিন আমাকে ওদের থাকার জায়গার অনেক মজার মজার গল্প বলছিল আর আমাকে ওদের ওখানে ঘুরে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করল। আর তার কিছুদিনের মধ্যে ৩ দিনের একটা লম্বা ছুটি চলে আসায় আমিও এই নতুন আর প্রায় হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের সাথে আবার দেখা করার লোভটা আর সামলাতে পারলাম না।



ইয়ার্ট

কার্ক আর ক্যারোলিন থাকে মন্টানা রাজ্যে মিসোউলা শহরের কাছে একটা পাহাড়ের উপরে একটা বড় তাঁবুতে। এই বিশেষ ধরণের তাঁবুর নাম হল "ইয়ার্ট"। এই বিশেষ ধরণের তাঁবু সাধারণত দেখা যায় মধ্য এশিয়া আর মঙ্গোলিয়াতে। এখানকার মানুষেরা অনেক সময়েই ইঁট-কাঠ দিয়ে বাড়িঘর না বানিয়ে এই ধরণের তাঁবুতে বসবাস করে। এর মধ্যে যে সবরকম বন্দোবস্তই থাকে তা নয়, তার সাথে প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ইয়ার্টগুলো হয় ইঁট-পাথরের ইমারতের মতই শক্তপোক্ত।

মিসোউলা শহরটা আমার বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মেইল দূরে। গাড়ি চালিয়ে পৌঁছলাম প্রায় ৯/১০ ঘন্টা পরে। আমি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা চিনে যেতে পারব না ভেবে কার্ক আর ক্যারোলিনই শহরে চলে এসেছিল। মিসোউলা শহরটা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম-সাজানো গোছানো। দু'দিকের পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা নদী শহরের শোভা অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। ওদের সাথে কিছুক্ষণ হেঁটে ঘুরে বেড়িয়ে অদের অনসরণ করেই পৌঁছলাম একটা পাহাড়ের মাথায় ওদের তাঁবুতে। শহর থেকে এটা প্রায় ২৫০০ ফুট উপরে। বনের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের রাস্তায় গাড়ি নিয়ে আসার সময় মুগ্ধ হলাম এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে, মনটা আনন্দে নেচে উঠল যখন আমার খুব কাছ দিয়ে একদল বন্য হরিণ দৌড়ে পালিয়ে গেল, আর এদিক-ওদিক থেকে দেখতে আর শুনতে পেলাম নানাজাতের নাম না-জানা পাখী আর তাদের ডাক। কার্ক আর ক্যারোলিনের কাছেই পরে শুনেছিলাম যে ভাগ্য ভাল থাকলে এই রাস্তাতেই অনেক সময় অনেক প্রজাতির পাহাড়ী সাপ আর ভালুকও দেখা যায়। আর মানুষ তাদের বিরক্ত না করলে তারাও সাধারণত মানুষকে অগ্রাহ্য করেই চলে।

পাহাড়ের মাথায় এসে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে চারিদিকের বন আর পাহাড়গুলোর গাম্ভীর্য আর নির্জনতার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতেই অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। কার্ক আর ক্যারোলিনের ইয়ার্ট খুব পাকা শিল্পীর মত সুন্দর করে সাজানো। তার ভিতরে যেমন আছে রান্নাঘর, খাবার জায়গা, স্নানঘর, আবার একদিকে রয়েছে একটা বেশ বড় বসার জায়গা আর অনেক বিষয়ের উপর বিভিন্ন বইয়ের একটা বিরাট সংগ্রহ। পাহাড়ের উপর আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদান - টেলিভিশন, ইন্টারনেট - এগুলোকে ওরা ইচ্ছা করেই অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছে। ওদের অবসর সময়ের সঙ্গী হল ওদের সংগ্রহের বই। তাতে বিভিন্ন বিষয়ে ওদের জ্ঞানের পরিধি যেমন বড় হয়েছে আর তার সাথে ওদের মনটাও অনেক খোলামেলা আর উদার হয়েছে।

তা ছাড়াও ওদের অবসর সময় কাটে ওদের ২টো পোষা বিড়াল, একটা পোষা কুকুর আর একটা পোষা সাপের সাথে। যে কোন সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর প্রতিই আমার একটা অস্বস্তি আছে বলে (যদিও এই সাপটা বেশীরভাগ সময়ে কাঁচের ভিতরেই থাকে আর একেবারেই নিরীহ), সাপটাকে আমি শুধু কাঁচের বাইরে থেকেই দেখেছিলাম, কিন্তু অন্য পোষা প্রাণীগুলোর সাথে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল এই ২/৩ দিন থাকার সময়ে। ওদের তাঁবুতে আমার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল অদের শোওয়ার জায়গাটা। তাঁবুর মাথায় একদম মাঝখানে একটা জায়গা দিয়ে আলো আসার ব্যবস্থা আছে। এখান দিয়ে সূর্যের আলো তো বটেই, তাছাড়া শুক্লপক্ষের রাতে চাঁদের আলো ঢুকে বেশ সুন্দর দেখতে লাগে। মাটি থেকে একটু উপরে মই দিয়ে উঠে এই আলো ঢোকার জায়গার নীচেই হল ওদের শোওয়ার ব্যবস্থা।



স্কাইলাইট

আরেকটা জায়গা যেটা খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল এই দু'দিনে সেটা হল তাঁবুর পিছনে। তাঁবুর পিছনে পাহাড়ের খাত যেখান থেকে শুরু হয়েছে তার মাঝে একফালি জায়গা। সেখানে পাতা আছে কয়েকটা চেয়ার আর মাঝে রয়েছে সিমেন্ট আর মাটি দিয়ে তৈরী করা একটা চিমনী। সন্ধ্যের পর যখন বাইরে একটু ঠান্ডা থাকে তখন পাহাড়ের বন থেকে কেটে আনা কাঠ চিমনীর নীচে জ্বালালে যেমন বসে আগুন পোহাতে খুব ভাল লাগে, তার সাথে চারিদিকের ঘন অন্ধকারে চিমনীর মাথা দিয়ে ওঠা আগুনের শিখা একটা মায়াবী সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।



চিমনি

হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে ১০ ঘন্টা যাত্রার ধকল একটু সামলে ওঠার পর কার্ক আর ক্যারোলিন আমাকে নিয়ে গেল ওদের বাগান আর গ্রীনহাউস দেখাতে। তুমি কি কখনও গ্রীনহাউসের কথা শুনেছ? ভিতরটা দেখতে এমনিতে সাধারণ বাগানের মতই। কিন্তু বাইরের চারিদিক আর উপরের দিকে কাঁচ বা প্লাস্টিকের স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। ফলে দিনের সূর্যের তাপ এর মধ্যে ঢুকে আটকা পড়ে থাকে - তাই সবসময়েই ভিতরটা বেশ উষ্ণ আর আর্দ্র থাকে। যে ধরণের গাছপালা আর সব্জি ঠান্ডা বা শুষ্ক আবহাওয়াতে ভাল বড় হয়না, তাদের জন্য বিশেষভাবে এই ব্যবস্থা। এ সবই ওদের নিজেদের হাতে তৈরী। তার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের গাজর, মূলো, বীট, লঙ্কা, টম্যাটো, বীন আর নানারকমের শাক এত হয় যে বেশীরভাগ সময়েই ওদের আর বাজার থেকে শাকসব্জি কেনার প্রয়োজন হয়না।



গ্রীনহাউসে টমেটো

এর একটু দূরেই রয়েছে দুটি কাঠের বাক্স যার মধ্যে মৌমাছিরা এসে মৌচাক বানায়, আর তার মধু কার্ক আর ক্যারোলিন বাড়ির কাজে ব্যবহার করে। ভালুকের হাত থেকে মধু বাঁচানোর জন্য এর চারপাশ ঘেরা রয়েছে সরু ইলেকট্রিকের বেড়া দিয়ে। এর বিদ্যুৎ আসে তারের সাথেই লাগানো একটা সোলার প্যানেল থেকে। এছাড়াও রয়েছে আরও দুটো বেশ বড় সোলার প্যানেল। ওদের বাড়ির ইলেকট্রিসিটির বেশীরভাগই ওই দুটো সোলার প্যানেল থেকে তৈরী হয়। আর বাকিটা তৈরী হয় জেনারেটর থেকে। আশেপাশের দু-তিনটে পাহাড়ে কার্ক আর ক্যারোলিন ছাড়াও আরো ২/৩ টি পরিবার বাস করে। পাহাড়ের একটা কুয়ো থেকে পাম্পের সাহায্যে বাড়িতে জল আসে। তাই জলের অপচয় ওদের কাছে একটা বিলাসিতা।



সোলার প্যানেল

গল্পগুজব করতে করতেই সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির বাগান আর গ্রীনহাউসের সবজি আর বাজার থেকে কিনে আনা মাংস দিয়ে রাতের খাবার শেষ হল। বাগান থেকে হাতে তোলা সবজি খাওয়ার যে কি মজা সেটা দারুণভাবে উপভোগ করলাম। খাওয়ার পর আরো কিছুক্ষণ গল্প চলল। শুনছিলাম ওদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা, আর ওরাও শুনছিল আমার কথা। ওদের তাঁবুর পাশেই আমার জন্য একটা ছোট তাঁবু টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল কার্ক আর তার ভিতরে তোশক, কম্বল আর বালিশ পেতে দিয়েছিল। ওদের আতিথেয়তাতে ততক্ষণে আমি পুরোপুরি মুগ্ধ।

রাস্তার ধকলের জন্য শরীর ক্লান্ত থাকায় বেশ চমৎকার ঘুম হল রাতে। সকালে আমার তাঁবুর পাশেই পাখীদের কিচিরমিচির আওয়াজে ঘুম ভাঙল। আমার প্রতিদিনের কর্কশ আর নিষ্ঠুর অ্যালার্মের আওয়াজের থেকে এটা যে কত গুণ মধুর সেটা বলে বোঝাতে পারব না। পাউরুটির সাথে নিজেদের মৌচাকে তৈরী মধু আর কফি দিয়ে সকালের জলখাবার সারা হল। এরপর কিছুক্ষণ কার্ক আর ক্যারোলিন বাড়ির কিছু কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ক্যারোলিন করছিল বাগানের গাছপালার পরিচর্যা আর কার্ক "রুট সেলার" তৈরীর কাজ। "রুট সেলার" হল মাটিতে গর্ত করে আর তার চারিপাশে তাপের অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে ঘিরে তৈরী একটা ঘরের মত। শীতের সময় যাতে খাবার জোগাড় জমা করে রাখা যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা। আমিও কার্ক-কে খানিকক্ষণ সাহায্য করলাম মাটি কোপানো আর চারিপাশের ঘিরে রাখা রাবারের টায়ারে মাটি ভর্তি করার কাজে। আর মুগ্ধ হচ্ছিলাম ওদের দুজনের এই সব কাজে পরিশ্রম আর উদ্যোগ দেখে।

এরপর একটু বেলার দিকে আমরা দুপুরের কিছু খাবার প্যাকেটে ভরে আর ওদের দুটো কুকুরকে সাথে করে গেলাম একটা পাহাড়ে চড়তে। বেশ অনেকটা হাঁটলাম আমরা - প্রায় ২৫০০ ফুট উঠলাম একটা পাহাড়ের উপরে আর ওঠানামা মিলিয়ে হাঁটলাম প্রায় ৬ মাইল পথ। পাহাড়ের একদম উপর থেকে শহরটা, তার ইউনিভার্সিটি, আশেপাশের অন্য পাহাড়গুলো আর তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটা

দেখতে বেশ চমৎকার লাগে। পাহাড়ের মাথাতেই বসে একটু হালকা খাবার খেয়ে নেওয়া হল। যখন আমরা পাহাড়ের নীচে নেমে এলাম তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। ক্যারোলিন বাগানের সবজি, আর বাজার থেকে কিনে আনা ভুট্টা আর মাংস দিয়ে রাতের খাবারের বন্দোবস্ত শুরু করল। আমরাও অল্পস্বল্প সাহায্য করলাম হাতের কাজে। অদের আরেক বন্ধুও এসেছিল আমাদের সাথে ডিনার করার জন্য। খাবার পর অনেকক্ষণ আড্ডার পর সারাদিনের হাঁটাহাঁটি আর পরিশ্রমে বেশ তাড়াতাড়িই ঘুম পেয়ে গেল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। আজই আমার ফিরে আশার পালা। ওদের দুজনকে বিদায় জানাতে বেশ খারাপ লাগছিল - কিন্তু উপায় তো আর নেই। লম্বা রাস্তায় আমার যাতে অসুবিধে না হয় সেজন্য ক্যারোলিন বেশ কিছু গাজর একটা প্যাকেটে আমার জন্য রেখে দিয়েছিল। এইভাবেই ক্যারোলিন, কার্ক, পাহাড়, জঙ্গল আর মিসোউলাকে বিদায় জানিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এই ক'দিনের টাটকা খাবার আর টাটকা হাওয়ায় শরীরটা এতটাই ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিল যে ৯ ঘন্টা যাত্রার পরেও খুব বেশী ক্লান্ত লাগছিল না।

দূরত্বটা অনেক বেশী। তাই জানিনা আবার কবে ওদের সাথে দেখা হবে। কিন্তু সেটা যবেই হোক, ওদের বন্ধুত্বটা চিরকাল মনে গেঁথে থাকবে।

লেখা ও ছবিঃ
পাভেল ঘোষ
হিলস্‌বোরো, ওরেগন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

পরশমণি: পদার্থের প্রসারন



নতুন জ্যাম-জেলির কৌটো কখনও খুলবার চেষ্টা করেছ? পারবেই না খুলতে। কেননা এত শক্ত করে আঁটা থাকে! সেই রান্নাঘরে গিয়ে মা-এর সাহায্যই নিতে হবে!দেখ মা কেমন করে খোলেন সেটা।

মা সসপ্যানে খানিকটা জল গরম করে কৌটোর ঢাকনার দিকটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে (অর্থাৎ কৌটোটা উল্টো করে) দিলেন। কিছুক্ষণ রাখার পর সেটা তুলে ধাতব ঢাকনায় সামান্য চাপ দিয়ে ঘোরাতেই সেটা খুলে গেল!

কি করে হল বল দেখি। খুলতেই চাইছিল না, একটু গরম করতেই কেমন চট করে খুলে গেল ম্যাজিকের মত। আসলে গরম পেয়ে কৌটোর ঢাকনাটা সামান্য একটু বড় হয়ে গিয়ে এই কান্ডটা ঘটালো। বড় হয়ে গেলে কাচের কৌটোর গায়ে চেপে বসা ঢাকনাটা ত আলগা হবেই, তাহলে আর খুলতে অসুবিধেটা কোথায়! কিন্তু একটা কথা রয়েছে, ধাতব ঢাকনার সাথে সাথে কৌটোর কাচটাও ত বড় হবে, তাহলে আর ঢাকনাটা আলগা হবে কি করে, তাই না! কিন্তু তাহলেও ঢাকনাটা একটু বেশী বাড়বে, দুটো কারণে। এক, গরম জলের সংস্পর্শে থাকায় ধাতব ঢাকনাটা বেশী গরম হবে, আর দুই,কাচের তুলনায় ধাতু বেশী বেড়ে যায়।

বেড়ে যাওয়ার মানেটা বুঝলে? সেটা বলি শোন। আমরা আমাদের চারপাশে যত জিনিষ দেখি, সবগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করে ফেলা যায়। এই তিনটি ভাগের নাম হল, কঠিন, তরল আর গ্যাসীয় পদার্থ। এদের নানা ধর্ম আছে, তার মধ্যে একটি হল, গরম হলে এরা প্রত্যেকেই আকারে বেড়ে যায়। এই বেড়ে যাওয়া বা প্রসারিত হওয়াকে বলে 'পদার্থের প্রসারন'। জ্যামের কৌটোটা কাচের আর ঢাকনাটা ধাতুর তৈরী, সুতরাং কঠিন পদার্থ। তাই এদের প্রসারনকে বলে 'কঠিন পদার্থের প্রসারন'।

এমন প্রসারনের আর একটা উদাহরন দিচ্ছি। কলকাতা শহরে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর বিদ্যুতবাহী তার মাটির তলা দিয়ে গেলেও অন্যত্র রাস্তার পাশে খুঁটির পর খুঁটি পুঁতে তার টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। দিনের বেলায় দু'টি খুঁটির মধ্যেকার তার মোটামুটি টানটান থাকলেও সন্ধ্যার পর সেই তার একটু ঝুলে যায়। লক্ষ্য করেছ কখনও? না করে থাকলে এবার করবে। বলতে পারবে তার কেন ঝুলে যায়?

দিনের তুলনায় রাতে বেশী বিদ্যুৎ চলাচল করে, ফলে তার বেশী গরম হয়ে প্রসারিত হয়ে ঝুলে যায়!

কোন পরিবাহিতে (এখানে ধাতব তার) বিদ্যুত প্রবাহিত হলে সেটা গরম হয়ে যায় কিনা!

গরম হলে যেমন পদার্থ প্রসারিত হয়, ঠান্ডা হলে তেমনই সংকুচিত হয় বা ছোট হয়ে যায়। জ্যামের কৌটো গরম জলে না ডুবিয়ে ঠান্ডা জলে ডোবালে ঢাকনাটা আরও চেপে বসে যেত। খোলাই যেত না।

এ'ত গেল কঠিন পদার্থের প্রসারনের কথা। এবার তরলের প্রসারনের কথা।

সংকোচন দিয়ে শুরু করি। সরু মুখের কাচের একটা বোতল পুরো জলভর্তি কর (একেবারে বোতলের মুখ পর্যন্ত টায় টায়)। টোম্যাটো সসের বোতল হলেও চলবে। ফ্রিজ থেকে বরফ বের করে একটা বাটিতে রাখ আর বরফের মধ্যে জলভর্তি বোতলটা বসিয়ে দাও। কিছুক্ষণ পর দেখ। কি দেখবে বল দেখি? জলের লেভেল কিছুটা নেমে এসেছে। কারণ হল বোতলের জল ঠান্ডা বরফের সান্নিধ্যে এসে সংকুচিত হয়ে গেছে। তাই লেভেল নেমে গেছে।

এবার বোতলটা বরফ থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখ। টেবিল বরফের চেয়ে গরম, সুতরাং জল এবার গরম হতে থাকবে। একটু পরে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে বোতলে জলের লেভেল আবার উঠে গিয়ে আগের অবস্থায় চলে এসেছে। এর মানে কি হল? এর মানে হল জল গরম হওয়ার কারণে প্রসারিত হল।

বোতলটা যদি গরমজলে বসিয়ে দাও তাহলে দেখতে পাবে যে বোতলের জল উপচে পড়ে যাচ্ছে, কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ! জল তাপ পেয়ে আয়তনে বাড়ছে। জল না হয়ে অন্য কোন তরল হলেও একই ফল হত। এই প্রসারনকে বলে 'তরলের প্রসারন'।

এ রকম আর একটা উদাহরণ দিই। জ্বর হলে আমরা থারমোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা দেখি,তা থেকে বুঝতে পারি শরীর কতটা উত্তপ্ত। থারমোমিটারের কুন্ডতে যে রুপোলী পদার্থ থাকে সেটা হল তরল ধাতু 'পারদ'। কুন্ডটা শরীরের সংস্পর্শে আনলে তরল পারদ শরীরের উত্তাপ অনুযায়ী প্রসারিত হয়,আর থারমোমিটার -এ সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি কতটা জ্বর হল।

বাড়িতে থারমোমিটার আছে ত? তার কুন্ড বা বাল্‌বটা হাতের মুঠোয় ধর, দেখ কেমন করে পারদ উঠে যাচ্ছে তরতর করে। এখানেও একটা কথা আছে, পারদের সাথ সাথে কাচও বাড়বে তবে পারদের বৃদ্ধিটা এতই বেশী যে কাচেরটা বোঝাই যায় না! তরলের বৃদ্ধির হার কঠিনের চেয়ে বেশী।



এবার গ্যাসের প্রসারনটা কি দেখা যাক। একটা বেলুন টান টান করে, মানে বেশী করে হাওয়া ভরে ফুলিয়ে মুখটা ভাল করে বাঁধ যাতে হাওয়া বেরিয়ে না যায়। এবারে সেটাকে রোদে ফেলে রাখ। একটু

পরে দেখবে অবাক কান্ড! ফটাস করে বেলুনটা ফেটে যাবে! কেন, সেটা বুঝলে কিছু?

আসলে বেলুনটা রোদে ফেলে রাখলে বেলুনের ভেতরের বাতাস গরম হয়ে আয়তনে বাড়তে থাকে, আর তাতে বেলুনও আরও ফুলতে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ আর ফুলবে? একসময় ত ফেটে যাবেই! কিনা বল!

যদি ফোলানো বেলুনটা রোদে না রেখে ফ্রিজের ভেতর রেখে দাও তাহলে কিছুক্ষণ পর কি দেখবে বলত!বেলুনটা রীতিমত চুপসে ছোট হয়ে গেছে! কারণটা কি? কি আবার! ঠান্ডায় বেলুনের বাতাস আয়তনে কমে গেছে আর তাতেই বেলুন ছোট হয়ে গেছে!

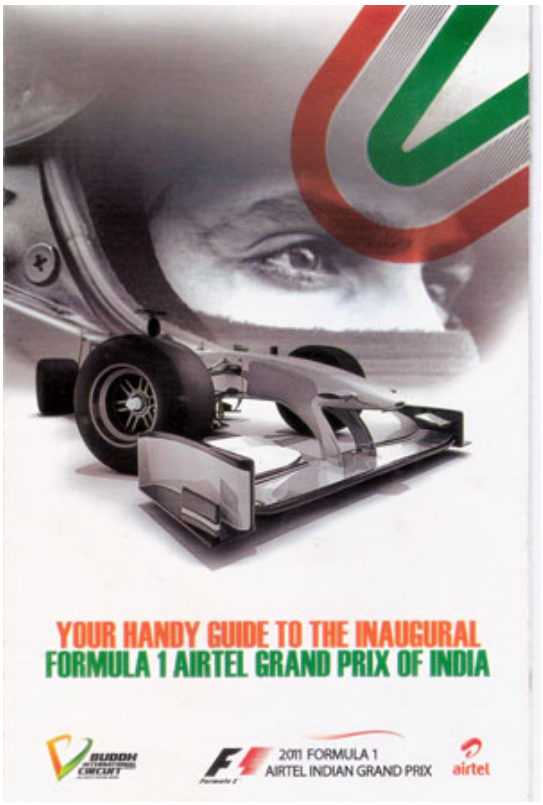
তাহলে দেখতে পেলে, কঠিন আর তরলের মত বাতাস বা অন্য গ্যাসও তাপ পেলে আয়তনে বাড়ে ঠান্ডা হলে আয়তনে কমে। এর নাম 'গ্যাসের প্রসারন'। গ্যাসের প্রসারনের হার তরলের চেয়ে বেশী।

নানাভাবে পদার্থের এই সব প্রসারন আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। এ বিষয়ে বড় হয়ে আরও অনেককিছু জানতে পারবে।

সন্তোষ কুমার রায়
কোদালিয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

ছবিঃ ইন্টারনেট

এক্কা-দোক্কা: ফর্মুলানন্দ



২০১১ ভারতের খেলাধূলার জগতে এক নতুন অধ্যায় রচনা করল। তথাকথিত স্পোর্টসের পাশাপাশি এবছর উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ফর্মুলা ওয়ান গাড়ির রেস। মনে হয় ভারতের মাটিতে যে স্পোর্টসের সূচনা হল এবার আগামী বছরগুলিতে এর উন্মাদনা অব্যাহত থাকতে বাধ্য। এখন নাকি ফুটবলের মাঠে ভীড় হয়না মোটে, ক্রিকেটের প্রচুর অবিক্রীত টিকিট পড়ে থাকে। কিন্তু ঐ তিনদিন অর্থাত ২৮শে অক্টোবর থেকে ৩০শে অক্টোবর নয়ডায় জেকে গ্রীণ স্পোর্টস সিটিতে একলাখেরো বেশি উপচে পড়া মানুষের ভীড় দেখে সে কথা মনে হল না।

"বুক মাই শো" তে অনলাইন টিকিট কাটার পর টানটান উত্তেজনায় ছিলাম ক'টা মাস। অবশেষে সব প্রতীক্ষার অবসান হল। সারাদেশ জুড়ে একদিকে জ্বলছে দীপান্বিতার আলোকমালা আর নয়ডার 'জেপি গ্রীণ স্পোর্টস সিটি' তে তখন সাজোসাজো রব, ইনঅগুরাল ফর্মুলা ওয়ান গ্রাঁ প্রি' র। বাতাসে হিমের ছোঁয়া নিয়ে ঊণতিরিশ এবং তিরিশে অক্টোবর হাজির হয়েছিলাম আমরা সেই বুদ্ধ ইন্টারন্যাশানাল সার্কিটে। কিছুদূর গাড়ি করে যাবার পর শাটলবাস আমাদের নিয়ে গেল স্টেডিয়ামে। নিজেদের টিকিট অনুযায়ী নির্ধারিত জায়গায় বসে পড়লাম। প্রথমে ছিল বেশ কিছু প্র্যাকটিস সেশন এবং ফর্মুলা ওয়ান গাড়ি ছাড়া অন্যান্য গাড়ির প্রথাগত রেস। ৩০ তারিখে ফাইনাল রেসের ঠিক আগে হেলিকপ্টার আকাশ থেকে বারবার এসে ট্র্যাক পরিদর্শন এবং ছবি তুলতে লাগল। তারপর শুরু হল একে একে ড্রাইভারস প্যারেড। একটি করে ভিন্টেজ কারে এক একজন ড্রাইভার একে একে হাত নেড়ে রাজকীয় কায়দায় ট্র্যাক পরিক্রমা করে চলে গেলেন। তারপর সেফটি কার এসে বারে বারে ট্র্যাকের নিরাপত্তা পরিদর্শন করে গেল। তারপর এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।



অবশেষে 'দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?' হ্যাঁ, ছিলেন আমাদের শিবরাত্তিরের সলতে নারায়ণ কার্তিকেয়ণ আর ফোর্স ইন্ডিয়া টিমে ছিলেন চালক সুটিল।

খেলার মাঠে কারো লক্ষ্য বলের গতিতে কারো কবজির জোর টেনিস র‍্যাকেট এ, কারো আনন্দ পায়ে বল মারাতে। কেউ চলে জলের স্রোতে সাঁতারাতে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে পোলো খেলায়, কেউ দাবার চালে, কেউ ধনুর্বিদ্যায়। কারো আবার আনন্দ এবং লক্ষ্য দুইই গতিতে এবং গতির আনন্দে। এবার আলোচনা করা যাক ফর্মুলা ওয়ান কি এবং কেন এই সম্বন্ধে।

ফ্রান্সের সংস্থা "ফেডারেশান ইন্টারন্যাশানাল ডি লা অটোমোবাইল" (FIA) এই বিশেষ রেসের জন্য গাড়িগুলির জন্য যে আকার, আকৃতি এবং গঠনের ফর্মুলা নির্ধারণ করে দিয়েছে সেই অনুসারে "ফর্মুলা ওয়ান" গাড়ি তৈরী হয়। এই ফর্মুলাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

-গাড়ির মাঝখানে ইঞ্জিন থাকতে হবে,
-উন্মুক্ত ককপিট থাকবে,
-একটিমাত্র সিট থাকবে,
-উইং থাকবে সামনে ও পেছনে,
-গাড়ির চালক সহ গাড়ির ওজন হতে হবে মাত্র ৬৫০কেজি
-গাড়িটি যেন ঘন্টায় শূন্য থেকে ১৬০কিমি যেতে পারে ও ৫ সেকেন্ডের কম সময় যেন ঐ স্পীড কমে আবার যেন নেমে আসতে পারে



এই স্পেসিফিক ফর্মুলায় তৈরী গাড়িকেই বলে ফর্মুলা ওয়ান গাড়ি। GP Motor Sports অর্থাত Glitz & Glory, Power & Precision, Man & Machine, Speed & Style এই চারটির সমন্বয়ে তৈরী হয় ফর্মুলা ওয়ান। এখানে গাড়ী এবং তার চালক হল প্রধান। গাড়ী শুধু জোরেই যায় না কিন্তু অসাধারণ কায়দা এবং কৌশলের বৈচিত্র্যে ভরা এই স্পোর্টস। বারটি টিমের চব্বিশটি ড্রাইভার সহ চব্বিশটি গাড়ি যেন প্রত্যেকটি এক একটি আইকনিক অবতার। গতিশীলতা যাদের শিরায় শিরায়, হৃত্স্পন্দনে সুস্থিরতা। গাড়ীর ইঞ্জিনের গর্জন যত বেশি গাড়ির চালকদের হৃত্স্পন্দন বা পাল্স রেট ততই ক্ষীণ। গাড়ির গতির ওঠানামায় ড্রাইভারদের উত্তেজনার পারদকে কঠিন নিয়ন্ত্রণে রেখে অসাধারণ নৈপুণ্যে বিদ্যুত্গতির গাড়িগুলিকে অত্যন্ত জটিল পথ এবং পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে প্রতিঘন্টায় সর্বোচ্চ ৩০০ কিমি বেগে সবশুদ্ধ ৩০০কিমি পথ অতিক্রম করতে হয়। গাড়ি যে থামে না এমন নয়। এক অবিশ্বাস্য আট সেকেন্ডের মধ্যে গাড়িকে থামিয়ে চারটি চাকা বদল করে এবং ট্যাঙ্কে জ্বালানী ভরে নিয়ে ধনুক থেকে তীরের মত ছিটকে বেরিয়ে পড়ে সেই গাড়ি আবার ট্র্যাকে গতিপ্রাপ্ত হয়ে। এ ওকে অতিক্রম করতে গিয়ে ঠোকাঠুকি লাগে এবং অনেক সময় গাড়ি ট্র্যাক থেকে বেরিয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত কখনো কখনো দুর্ঘটনার মুখে পড়ে গাড়ি ও তার চালক। হতাহত হয় চালক। দর্শক আহত হবার নজির ও আছে এই রেসে যখন গাড়ি লাফিয়ে এসে দর্শকাসনে পড়েছে। তাই বিশাল ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থা থাকে এখন। কিন্তু এ সবকে তুচ্ছজ্ঞান করে ড্রাইভার্, মেকানিক ও দর্শকরা এই অসাধারণ উন্মাদনায় মেতে ওঠেন কারণ ফর্মুলা ওয়ান একটি ক্রীড়া নয় এটি একটি জীবনধারার প্রতীক। যারা এই উন্মাদনায় মাতেন তারা অনেকেই ভাবেন যে তাদের ধমনীতে রক্ত নয় যেন পেট্রোলের তরঙ্গ বয়ে চলেছে এবং হৃত্পিণ্ডের বদলে ৬ সিলিন্ডার ও ৩ লিটারের V-6 ইঞ্জিন তাদের বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে। আর চব্বিশটি গাড়ি যেন উচ্চৈঃস্বরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে বলে আমাকে বাঁচতে দাও; তারস্বরে গগনভেদী চিত্কারে বলে ওঠে আমাকে আগে যেতে হবে, আমাকে শিখরে পৌঁছতে হবে কিম্বা হাম হোঙ্গে কামেয়াব।



গতির ছন্দে মেতে উঠে গতির দুনিয়ায় পা রেখেছেন ভারতের নারায়ণ কার্তিকেয়ণ; ফর্মুলা ওয়ান রেস করেছেন ভারতের বাইরে। ভারতীয় মালিকানায় ফর্মুলা ওয়ান টিম ফোর্স ওয়ান আগে ছিল বিজয় মাল্যর। অধুনা সেটি যৌথ ভাবে বিজয় মাল্য এবং সাহারার মালিকানায়। কিন্তু ভারতের মাটিতে ফর্মুলা ওয়ান টিম পা রাখল এই বছর অর্থাত ২০১১ র অক্টোবরে। ২০১১ সালের ১৭তম রেসটি হল ভারতের মাটিতে, উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায়। নয়ডার বুদ্ধ ইন্টার ন্যাশানাল সার্কিটে ২৮, ২৯ ও ৩০ শে অক্টোবর ফর্মুলা ওয়ান রেস হল। এবছর এই টিমে সবশুদ্ধ বারোটি দলের চব্বিশটি গাড়ির চব্বিশজন ড্রাইভার যথার্থই কাঁপিয়েছেন ভারতবর্ষের মাটি। প্রত্যেক টিমে দু'জন ড্রাইভার থাকেন।

এবার ছিলেন

- রেডবুল টিমের সেবেষ্টিয়ান ভেটেল এবং ওয়েভার,
- ভোডাফোন ম্যাকল্যারেন মার্সিডিজের হ্যামিল্টন ও জেনসন বাটন্,
- মার্সিডিজ জিপির মাইকেল স্যুমাকার ও নিকো রসবার্গ,
- স্কুডেরিয়া ফেরারির ফেলিপ মাসা ও ফার্ণান্ডো এলোনসো
- ফোরস ইন্ডিয়ার পল ডিরেষ্টা ও এড্রিয়ান সুটিল,
- রেনোর নিক হাইডফেল্ড ও ভিটালি পেট্রোভ,
- লোটাস রেনোর হাইকি কোভালাইনন ও ইয়ারনো ট্রুলি

- উইলিয়াম কসওয়ার্থ টিমের রুবেন্স ব্যারিচেলো ও প্যাষ্টার মালডোনাডো
- এইচ আরটি কসওয়ার্থ টিমের নারায়ণ কার্তিকেয়ণ ও ভিট্যান্টোনিও ল্যুইজি
- ভার্জিন কসওয়ার্থ এর টিমো গ্লক ও জেরোম ডি এমব্রোজিও,
- সবার ফেরারি টিমের কামুই কোবায়াশি ও সার্জিও পেরেজ এবং
- দ্বাদশ ও শেষ টিম টোরো রোসো ফেরারির সেব্যাস্টিয়ান বুয়েমি ও জেইম এলগ্যুয়ার সুয়ারি।

পৃথিবীতে ১৯৫০ থেকে ফর্মালি সব নিয়ম কানন মেনে আনুষ্ঠানিক ভাবে ফর্মুলা ওয়ান রেস হচ্ছে। সবচেয়ে গ্ল্যামারাস ও সফিষ্টিকেটেড স্পোর্টস হল ফর্মুলা ওয়ান। ব্যয়সাপেক্ষও বটে। উন্নতমানের প্রযুক্তি এবংবিশেষ কৌশলে তৈরী হয় এই ফর্মুলা ওয়ান গাড়িগুলি। বর্তমান যুগের গাড়িগুলি ৮সিলিন্ডারের ইঞ্জিন এবং ৩০০ হর্সপাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন। সবমিলিয়ে টিম ফর্মুলাওয়ানের কোঅর্ডিনেশন দেখবার মত। গাড়ির সাথে ড্রাইভারের, তার সাথে পিটক্রুদের সহযোগিতা, সেফটি কারের পথ প্রদর্শন বা ইয়ালো ফ্ল্যাগ দেখেই গাড়ি থামিয়ে রেস বন্ধ করে দেওয়া এও দেখার। এই ফর্ম্যুলা কারের চাকা এবং ইঞ্জিনই হল গাড়ির আসল জিনিস। চাকার লজিষ্টিকস এর অবদান এই রেসে অন্যতম। ভিজে মাটির জন্য একরকম চাকা এবং শুকনো মাটির জন্য আরেকরকম চাকা বরাদ্দ থাকে। আবার কোন চাকা কতক্ষণ রেস করার পর কত দ্রুত তাকে বদলাতে হবে তাও ভাবতে হয়। আর অবিশ্বাস্য হল গাড়ির চালকরা।

- এদের রক্তচাপ খুব কম হয়।
- নাড়ির বেগ বা পালস রেট হতে হবে অত্যন্ত কম।
- শরীরের ওজন হতে হবে অনূর্দ্ধ ৭০ কেজি।
- আর চশমা থাকলে নৈব নৈব চ।



দুর্দান্ত রেসিং ট্র্যাকটি তৈরী হয়েছিল। পুরো ট্র্যাকটি হল একটি ল্যাপ যার দৈর্ঘ্য হল ৫.১৪ কিমি। এবার ফাইনাল রেসের দিন অর্থাত ৩০শে অক্টোবর দুঘন্টায় বারোটি টিমের চব্বিশটি গাড়ি ৬০বার ঐ ট্র্যাক প্রদক্ষিণ করল। তার আগে ২৮ ও ২৯ তারিখে প্র্যাকটিস রেস বা কোয়ালিফাইং হল।



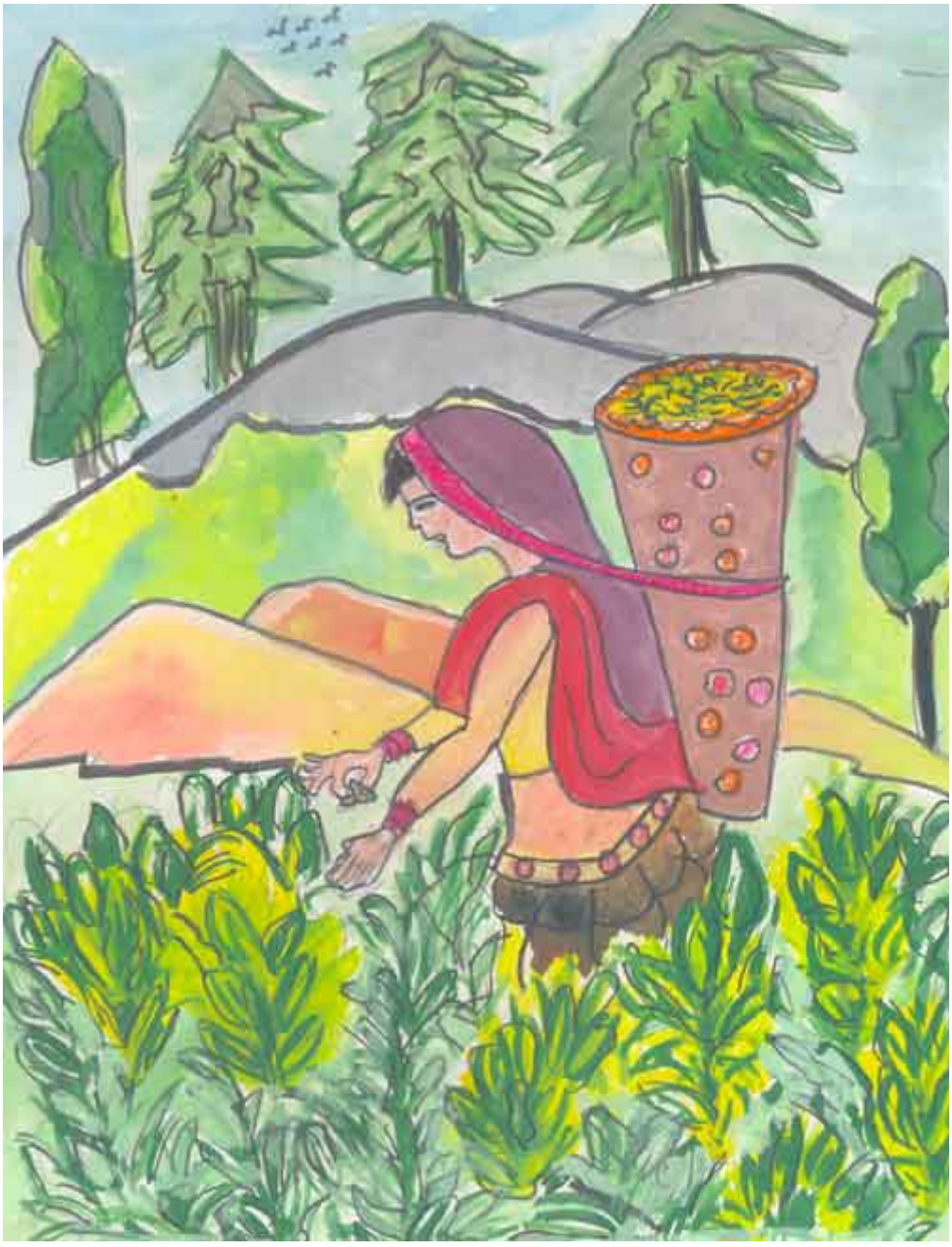
পর পর গগনভেদী চিত্কারে গাড়ীগুলি পিট থেকে বেরিয়ে মেইন ট্র্যাক ধরে চলতে শুরু করল। এভাবে ৬০ বার পরিক্রমা চলতে লাগল ঘন্টা দুই ধরে। কি চরম উত্তেজনার সামিল আমরা তখন! কখনো দুটি গাড়ি একে অপরকে ছুঁই ছুঁই, কখনো অবলীলায় চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই হুস করে সামনে দিয়ে চলে গেল। বুদ্ধ সার্কিটে ফর্মুলার ওয়ানের আসরে আকাশ বাতাস তখন গাড়ির শব্দে মুখর। কানে ইয়ার প্লাগ তবুও কাজ হলনা। পাশের লোকের কথাও শোনা যায় না সেই আওয়াজে। গতির লড়াইয়ে ২৪জন চালক তখন একে অপরকে টেক্কা দিতে ব্যস্ত। আমরাও গতির রোমাঞ্চে রোমাঞ্চিত। কি হয় কি হয়! আমাদের ট্র্যাকের সামনে দুবার অঘটন ঘটেছিল যা অবিশ্যি কিছুই নয়। কিন্তু চোখের সামনে দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। ফিলিপ মাসা এবং লুইস হ্যামিলটন একে অপরকে ওভারটেক করতে গিয়ে চাকায় চাকায় স্পর্শ করে; স্পিন খেয়ে মাসার গাড়ি ট্র্যাকের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আবার সে সাবলীল গতিতে ঢুকে এসেছিল ঠিকমত, যেন কিছুই হয়নি এই ভাবে। দুঘন্টা পর দেখা গেল সেবেস্টিয়ান ভেটেলই এগিয়ে রয়েছে সকলের চেয়ে। ৬০ ল্যাপের পর সেবেষ্টিয়ান ভেটেলকেই চাম্পিয়ান ঘোষণা করা হল। সামনে বিশাল টিভির স্ক্রিনে শচীন তেন্ডুলকারের চেকার্ড ফ্ল্যাগ নাড়া দেখে বুঝলাম খেলা শেষ।

লেখা ও ছবিঃ
ইন্দিরা মুখার্জি
ভবানীপুর, কলকাতা

আঁকিবুকি



দেবারুণ দেব, চতুর্থ শ্রেণী, এপিজে স্কুল, কলকাতা



মধুরিমা গোস্বামী, সপ্তম শ্রেণী, দ্য ভবানীপুর গুজরাতি এডুকেশন সোসাইটি স্কুল, কলকাতা



নীলাগ্নি দাস, দ্বিতীয় শ্রেণী, আর্মি পাব্লিক স্কুল, গুয়াহাটি



ঊর্মি ব্যানার্জি, নবম শ্রেণী, দ্য নিউ হরাইজন পাব্লিক স্কুল, নভি মুম্বই